কাব্যগ্রন্থ

অষ্টম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and published by Apurvakrishna Bose,
at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টম খণ্ড

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ
১৯১৬

সূচী

শিশু—

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারাবেলা।
উঠিছে তটে কি কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল পরি
ভাসায় তা'রা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি'
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তা'রা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে;
বণিক ধায় তরণী বেয়ে;
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতনধন খোঁজে না তা'রা,
জানে না জাল ফেলা।

ফেনিয়ে উঠে' সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে,
দোলনা ধরি' যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা।

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে ;
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

শিশু

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তা'র বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
ভোরে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

শিশু

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালবাসায়,
আমার মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে!

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি'।

জন্মকথা

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হ'লি কেমনে ?
ওই দেহে এই দেহ চুমি'
মায়ের খোকা হ'য়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে' দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখ্‌ব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে !

———

খেলা

তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙিন আঙিয়া ।

বিহান বেলা আঙিনা তলে
এসেছ তুমি কি খেলাছলে,
চরণ দু'টি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া ।
তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি ?
দুয়ার পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি ।

তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকণ বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনী।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি ?

ভিখারী ওরে, অমন করে'
সরম ভুলিয়া
মাগিস্ কিবা মায়ের গ্রীবা
আঁকড়ি ঝুলিয়া।
ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হ'তে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দু'টি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া ?
কি চাস্ ওরে অমন করে'
সরম ভুলিয়া ?

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।

ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।
নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী,
গায়ের-পরে-কোমল-করে-
পরশ-বুলানী।

মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি,
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবনমাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী।

খোকা

খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল তাপ-নাশা—
জান কি কেউ কোথা হ'তে যে
করে সে যাওয়া-আসা ?

শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা ;—
সেখান হ'তে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে—
কোন্ দেশে যে জনম তা'র
কে কবে তাহা মোরে ?

শিশু

শুনেছি কোন্ শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরুচি জনমি ছিল
শিশির-শুচি ভোরে,—
খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে।

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা—
জান কি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা ?
মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরাণ ছেয়ে
মাধুরীরূপে মূরছি ছিল
কহেনি কোনো কথা,—
খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা।

আশিষ আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হ'তে সে
বরষে তা'র শিরে ?

খোকা

ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে,
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশিষ আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে

এই যে খোকা তরুণ-তনু
নতুন মেলে আঁখি—
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা' কি ?
হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা,
তপন শশী তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি'
এই যে খোকা তরুণ তনু
নতুন মেলে আঁখি।

ঘুমচোরা

কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া ?
মা তখন জল নিতে ও পাড়ার দীঘিটিতে
গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া।—
তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা,
ওপারে নীরব চখাচখীরা,
শালিখ থেমেছে ঝোপে, শুধু পায়রার খোপে
বকাবকি করে সখা-সখীরা।
তখন রাখালছেলে পাঁচনী ধূলায় ফেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে ;
বাঁশ-বাগানের ছায়ে এক মনে এক পায়ে
খাড়া হ'য়ে আছে বক জলাতে।
সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরেতে পশিয়া মোর
ঘুম নিয়ে উড়ে গেল গগনে,
মা এসে অবাক্ রয়, দেখে খোকা ঘরময়
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে।

আমার খোকার ঘুম নিল কে !
যেথা পাই সেই চোরে বাঁধিয়া আনিব ধরে'
সে লোক লুকাবে কোথা ত্রিলোকে !

যাব সে গুহার ছায়ে কাল পাথরের গায়ে
কুলু কুলু বহে যেথা ঝরণা।
যাব সে বকুল বনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘর-করনা।
যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে জট
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে-দুপুরে,
যেখানে জলের কাছে বনদেবতারা নাচে
চাঁদিনীতে রুনুঝুনু নূপুরে।
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবনমাঝে
আলো যেথা জ্বালে রোজ জোনাকি,
শুধাব মিনতি করে' আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানাশোনা কি?

যে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে
কোনোমতে দেখা তা'র পাই যদি একবার
লই তবে সাধ মোর পুরায়ে!
দেখি তা'র বাসা খুঁজি কোথা ঘুম করে পুঁজি,
চোরাধন রাখে কোন্ আড়ালে!
সব লুটি ল'ব তা'র, ভাবিতে হবে না আর
খোকার চোখের ঘুম হারালে।

ডানা দুটি বেঁধে তা'রে নিয়ে যাব নদীপারে
সেখানে সে বসে' এক কোণেতে
জলে শর-কাঠি ফেলে মিছে মাছধরা খেলে
দিন কাটাইবে কাশ বনেতে।
যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা
ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
সারারাত টিটি পাখী টিট্‌কারি দিবে ডাকি
"ঘুমচোরা কার ঘুম হরিবে!"

অপযশ

বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল ?
কে তোরে যে কি বলেছে
আমায় খুলে বল্ !
লিখ্‌তে গিয়ে হাতে মুখে
মেখেছ সব কালী,
নোংরা বলে' তাই দিয়েছে গালি ?
ছি ছি উচিত একি ?
পূর্ণশশী মাখে মসী—
নোংরা বলুক্ দেখি !

বাছারে, তোর সবাই ধরে দোষ !
আমি দেখি সকল-তা'তে
এদের অসন্তোষ !
খেল্‌তে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে ?
ছি ছি কেমনধারা !
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে
সে কি লক্ষ্মীছাড়া !

শিশু

কান দিও না তোমায় কে কি বলে !
তোমার নামে অপবাদ যে
ক্রমেই বেড়ে চলে !
মিষ্টি তুমি ভালবাস
তাই কি ঘরে পরে
লোভী বলে' তোমার নিন্দে করে ?
ছি ছি হবে কি !
তোমায় যারা ভালবাসে
তা'রা তবে কি !

———

বিচার

আমার খোকার কত যে দোষ
সে সব আমি জানি,
লোকের কাছে মানি বা নাই মানি।
দুষ্টামি তা'র পারি কিম্বা
নারি থামাতে,
ভালোমন্দ বোঝাপড়া
তা'তে আমাতে।
বাহির হ'তে তুমি তা'রে
যেম্‌নি কর দুষী
যত তোমার খুসী,
সে বিচারে আমার কি' বা হয় ?
খোকা বলেই ভালবাসি
ভালো বলেই নয়।

খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝ ?
তোমরা শুধু দোষ গুণ তা'র খোঁজ।

আমি তা'রে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তা'রে কাঁদাই যেগো
আপনি কেঁদে !
বিচার করি শাসন করি
করি তা'রে দুষী
আমার যাহা খুসি !
তোমার শাসন আমরা মানিনে গো !
শাসন করা তা'রেই সাজে
সোহাগ করে যেগো !

চাতুরী

আমার খোকা করেগো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে।
যায় না সেকি সাধে ?
মায়ের বুকে মাথটি থুয়ে
সে ভালবাসে থাকিতে শুয়ে,
মায়ের মুখ না দেখে যদি
পরাণ তা'র কাঁদে।

আমার খোকা সকল কথা জানে
কিন্তু তা'র এমন ভাষা,
কে বুঝে তা'র মানে!
মৌন থাকে সাধে ?
মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তা'র কি আকুলতা,
তাকায় তাই বোবার মত
মায়ের মুখচাঁদে।

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের পরে
ভিখারীটির মত।
এমন দশা সাধে ?

শিশু

দীনের মত করিয়া ভাণ
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ,
তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে।

খোকা যে ছিল বাঁধন-বাধাহারা
যেখানে জাগে নূতন চাঁদ
ঘুমায় শুকতারা।
ধরা সে দিল সাধে?
অমিয়মাখা কোমল বুকে
হারাতে চাহে অসীম সুখে,
মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা
মায়ের মায়া-ফাঁদে।

আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না,
হাসির দেশে করিত শুধু
সুখের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাধে?
মধুমুখের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিয়া,
কান্না দিয়ে ব্যথার ফাঁসে
দ্বিগুণ বলে বাঁধে।

নির্লিপ্ত

বাছারে মোর বাছা,
ধূলির পরে হরষ ভরে
লইয়া তৃণগাছা
আপন মনে খেলিছে কোণে,
কাটিছে সারা বেলা।
হাসি গো দেখে' এ ধূলি মেখে
এ তৃণ ল'য়ে খেলা।

আমি যে কাজে রত,
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব কসি কত;
আঁকের সারি হতেছে ভারি
কাটিয়া যায় বেলা,—
সে ভাবে দেখি' মিথ্যা এ কি
সময় নিয়ে খেলা!

বাছারে মোর বাছা।
খেলিতে ধূলি গিয়েছি ভুলি
লইয়ে তৃণগাছা।

শিশু

কোথায় গেলে খেলেনা মেলে
ভাবিয়া কাটে বেলা,
বেড়াই খুঁজি' করিতে পুঁজি
সোনারূপার ঢেলা।

যা পাও চারিদিকে
তাহাই ধরি' তুলিছ গড়ি'
মনের সুখটিকে।
না পাই যারে চাহিয়া তা'রে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরি আশায় ফিরি'
ভাসাই মোর ভেলা।

কেন মধুর

রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং ওঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয় মাঝে বুঝিরে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কি কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে,
বুঝি তা' তোমারে গান শুনাই যবে।

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারি কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি'—
বুঝি তা' চুমিলে তোর বদনখানি।

খোকার রাজ্য

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—

তবে আমি একবার
জগতের পানে তা'র
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।

তা'র রবি শশী তারা
জানিনে কেমন ধারা
সভা করে আকাশের তলে,

আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে।

শুনেছি আকাশ তা'রে
নামিয়া মাঠের পারে
লোভায় রঙীন ধনু হাতে,

আসি শালবন পরে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তা'র সাথে।

যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,

খোকার রাজ্য

খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে।

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁসে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে—
সকল উদ্দেশহারা
সকল ভূগোল ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে ;—
যেথা আসে রাত্রিদিন
সর্ব্ব ইতিহাসহীন
রাজার রাজত্ব হ'তে হাওয়া,
তারি যদি এক ধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কারা করে আসা যাওয়া।
তাহারা অদ্ভুত লোক
নাই কারো দুঃখ শোক
নেই তা'রা কোনো কর্ম্মে কাজে,
চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক মাঝে।

সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশু পাখী
যাহা খুসি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ডরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে,—
তাই সে শোনে কত যে গান
কতই সুরে !

নানান্ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল ।

তিনি হাসেন, যখন তরু-
লতার দলে
খোকার কাছে পাতা নেড়ে
প্রলাপ বলে ।

সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী !

শিশু

সত্য বুড়ো নানা রঙের
মুখোস্ পরে
শিশুর সনের শিশুর মত
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম্ম
করে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
কর্‌তে খেলা।
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই,—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান
খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
চেতন প্রাণে।
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হ'য়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।
খোকা তারি মাঝখানেতে
বেড়ায় ঘুরে,

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে !
আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে,—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল ল'য়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্রমতে চলে
সূর্য্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে ল'য়ে
রসারসি !
এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
বৃক্ষ লতা
যেন তা'রা বোঝেইনাকো
কোনোই কথা !
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এম্‌নি ভাগে
যেন তা'রা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে !
মেঘেরা চায় এম্‌নিতর
অবোধ ভাবে
যেন তা'রা জানেইনাকো
কোথায় যাবে।

শিশু

ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে
সকল বেলা
যেন তা'রা কেবল শুধু
মাটির ঢেলা !
দীঘি থাকে নীরব হ'য়ে
দিবারাত্র—
নাগকন্যের কথা যেন
গল্পমাত্র !
সুখ দুঃখ এম্‌নি বুকে
চেপে রহে—
যেন তা'রা কিছুমাত্র
গল্প নহে !
যেমন আছে তেমনি থাকে
যে যাহা তাই—
আর যে কিছু হবে, এমন
ক্ষমতা নাই !
বিশ্বগুরুমশায় থাকেন
কঠিন হ'য়ে,
আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে !

প্রশ্ন

মাগো আমায় ছুটি দিতে বল
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা,
এখন আমি তোমার ঘরে বসে'
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বল্‌ছ দুপুর এখন সবে
না হয় যেন সত্যি হ'ল তাই,
একদিনো কি দুপুরবেলা হ'লে
বিকেল হ'ল মনে কর্‌তে নাই ?
আমি ত বেশ ভাব্‌তে পারি মনে
সূয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দিবুড়ি চুব্‌ড়ি ভরে' নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুরধারে এসে।
আঁধার হ'ল মাদার গাছের তলা,
কালী হ'য়ে এল দীঘির জল,
হাটে থেকে সবাই এল ফিরে,
মাঠের থেকে এল চাষার দল।
মনে কর না উঠ্‌ল সাঁঝের তারা,
মনে কর না সন্ধ্যে হ'ল যেন !
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুরবেলা রাত হয় না কেন ?

সমব্যথী

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা—
তবে, পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে' বল্
আমায় করিস্ নে মা ছল—
বল্‌তে আমায় "দূর্ দূর্ দূর !
কোথা থেকে এল এই কুকুর !"
যা' মা তবে যা' মা
আমায় কোলের থেকে নামা !
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে !

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা উড়ে
আমায় রাখ্‌তে শিকল দিয়ে ?

সত্যি করে’ বল্
আমায় করিস্ নে মা ছল—
বল্‌তে আমায় হতভাগা পাখী
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি
তবে নামিয়ে দে মা
আমায় ভালবাসিস্ নে মা !
আমি র’ব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে’ !

—

বিচিত্র সাধ

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখ্‌তে পাই
ফেরি-ওলা যাচ্চে ফেরি নিয়ে।
"চুড়ি চা—ই চুড়ি চাই" সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তা'র থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তা'র খুসি,
যখন খুসি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে শেলেট্ ফেলে দিয়ে
অম্‌নি করে' বেড়াই নিয়ে ফেরি।

আমি যখন হাতে মেখে কালী
ঘরে ফিরি—সাড়ে দশটা বাজে ;
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী
বাবুদের ঐ ফুলবাগানের মাঝে।
কেউ ত তা'রে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে,
গায়ে মাথায় লাগ্‌চে কত ধূলো
কেউ ত এসে বকে না তা'র কাজে !

মা তা'রে ত পরায় না সাফ্ জামা
ধুয়ে দিতে চায় না ধূলোবালী
ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ঐ ফুলবাগানের মালী!

একটু বেশি রাত না হ'তে হ'তে
মা আমারে ঘুমপাড়াতে চায়।
জান্‌লা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগ্‌ড়ি পরে' পাহার্-ওলা যায়।
আঁধার গলি লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লাণ্ঠানটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়।
রাত হ'য়ে যায় দশটা এগারোটা
কেউ ত কিছু বলে না তা'র লাগি!
ইচ্ছে করে পাহার-ওলা হ'য়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি!

———

মাষ্টার বাবু

আমি আজ কানাই মাষ্টার
　　পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।
আমি ওকে মারিনে মা বেত
　　মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি!
রোজ রোজ দেরি করে' আসে,
　　পড়াতে দেয় না ও ত মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
　　যত আমি বলি শোন্ শোন্!
　　দিন রাত খেলা খেলা খেলা
　　লেখায় পড়ায় ভারি হেলা!
　　আমি বলি চ ছ জ ঝ ঞ
　　ও কেবল বলে মিয়োঁ মিয়োঁ!

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
　　আমি ওরে বোঝাই মা কত—
চুরি করে' খাস্‌নে কখনো
　　ভালো হ'স্ গোপালের মত!

মাষ্টার বাবু

যত বলি সব হয় মিছে
কথা যদি একটিও শোনে !
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না আর মনে !
চড়াই পাখীর দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।
যদি বলি চ ছ জ ঝ ঞ
দুষ্টুমি করে' বলে মিয়োঁ !

আমি ওরে বলি বার বার
পড়ার সময় তুমি পোড়ো—
তা'র পর ছুটি হ'য়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো !
ভালো মানুষের মত থাকে,
আড়ে আড়ে চায় মুখ পানে,
এম্‌নি সে ভাণ করে, যেন
যা বলি বুঝেছে তা'র মানে !
একটু সুযোগ বোঝে যেই
কোথা যায় আর দেখা নেই !
আমি বলি চ ছ জ ঝ ঞ
ও কেবল বলে মিয়োঁ মিয়োঁ !

বিজ্ঞ

খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকী তোমার ভারি ছেলেমানুষ !
ও ভেবেছে তারা উঠ্‌ছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুষ !

আমি যখন খাওয়া-খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো করে' মুখে দেয় মা পুরি !

সাম্‌নেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি, খুকী পড়া করো,
দু'হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়্‌তে বসে,
তোমার খুকীর পড়া কেমনতর ?

আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুড়িগুড়ি
তোমার খুকী অমনি কেঁদে ওঠে,
ও ভাবে বা এল

বিজ্ঞ

আমি যদি রাগ করে' কখনো—
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি—
তোমার খুকী খিল্‌খিলিয়ে হাসে
খেলা কর্‌চি মনে করে ও কি ?

সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি—"আস্‌চে বাবা"—
তাড়াতাড়ি চারদিকেতে চায়,—
তোমার খুকী এম্‌নি বোকা হাবা !

ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা,
আমি বলি "আমি গুরুমশাই"
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে "দাদা !"

তোমার খুকী চাঁদ ধর্‌তে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা গাণুশ !
তোমার খুকী কিচ্ছু বোঝে না মা
তোমার খুকী ভারি ছেলেমানুষ !

———

ব্যাকুল

অমন করে' আছিস্ কেন মাগো ?
খোকারে তোর কোলে নিবি না গো ?
পা-ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কি যে ভাবিস্ আপন মনে,
এখনো তোর হয়নি ত চুল-বাঁধা !
বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজে
জান্‌লা খুলে দেখিস্ কি যে !
কাপড়ে যে লাগ্‌বে ধূলোকাদা !

ঐ তো গেল চারটে বেজে
ছুটি হ'ল ইস্কুলে যে
দাদা আস্‌বে মনে নেইক সিটি !
বেলা অমনি গেল ব'য়ে
কেন আছিস্ অমন হ'য়ে
আজকে বুঝি পাস্‌নি বাবার চিঠি ?
পেয়াদাটা ঝুলির থেকে
সবার চিঠি গেল রেখে
বাবার চিঠি রোজ কেন সে দ্যায় না ?
পড়বে বলে' আপনি রাখে
যায় সে চলে' ঝুলি কাঁধে,

পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না !
মাগো মা তুই আমার কথা শোন্ !
ভাবিস্ নে মা অমন সারাক্ষণ !
কাল্‌কে যখন হাটের বারে
বাজার কর্‌তে যাবে পারে
কাগজ কলম আন্‌তে বলিস্ ঝিকে ;
দেখো ভুল কোর্ব্বো না কোনো—
ক খ থেকে মূর্দ্ধণ্য ণ
বাবার চিঠি আমি দিব লিখে !
কেন মা তুই হাসিস্ কেন ?
বাবার মত আমি যেন
অমন ভালো লিখ্‌তে পারিনেকো !
লাইন কেটে মোটা মোটা
বড় বড় গোটা গোটা
লিখ্‌বো যখন তখন তুমি দেখো !
চিঠি লেখা হ'লে পরে
বাবার মত বুদ্ধি করে'
ভাব্‌চ দেব' ঝুলির মধ্যে ফেলে ?
কখ্‌খন না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে,
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে !

ছোটবড়

এখনো ত বড় হইনি আমি,
　　　　ছোট আছি ছেলেমানুষ বলে' !
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
　　　　বড় হ'য়ে বাবার মত হ'লে !
দাদা তখন্ পড়্‌তে যদি না চায়,
পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তা'রে এম্‌নি বকে' দেব' !
　　　　বল্‌ব "তুমি চুপ্‌টি করে' পড় !"
বল্‌ব "তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে !"
　　　　যখন হব বাবার মত বড় ।
　　তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
　　ভালো ভালো পুষ্‌ব পাখীর ছানা ।
সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
　　　　নাবার জন্যে করব না ত তাড়া ;
ছাতা একটা ঘাড়ে করে' নিয়ে
　　　　চটি পায়ে বেড়িয়ে আস্‌ব পাড়া ।
গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
　　　　চৌকি এনে দিতে বল্‌ব ঘরে ;—

তিনি যদি বলেন "শেলেট কোথা,
দেরি হচ্চে, বসে' পড়া কর,"—
আমি বল্‌ব "খোকা ত আর নেই,—
হয়েছি যে বাবার মত বড় !"
গুরুমশায় শুনে তখন ক'বে—
"বাবুমশায়, আসি এখন তবে !"
খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আস্‌বে বিকেল বেলা,
আমি তাকে ধমক দিয়ে কব,
"কাজ করচি, গোল কোরো না মেলা !"
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়,
একলা যাব, করব না ত ভয়,
মামা যদি বলেন ছুটে এসে—
"হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়"—
বল্‌ব আমি "দেখ্‌চ না কি মামা
হয়েছি যে বাবার মত বড় !"
দেখে' দেখে' মামা বল্‌বে "তাই ত,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই ত !"
আমি যেদিন প্রথম বড় হব
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে
আস্‌বে যখন খিড়কি দুয়োর দিয়ে
ভাব্‌বে "কেন গোল শুনিনে ঘরে ?"

তখন আমি চাবি খুল্‌তে শিখে
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্চি ঝি-কে,
মা দেখে তাই বল্‌বে তাড়াতাড়ি
"খোকা তোমার খেলা কেমনতর ?"
আমি বল্‌ব "মাইনে দিচ্চি আমি,
হয়েছি যে বাবার মত বড় !
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা এনে দেব' আবার !"
আশ্বিনেতে পূজোর ছুটি হবে
মেলা বস্‌বে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকো কতদূরের থেকে
লাগ্‌বে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি
খোকা তেম্‌নি খোকাই আছে বুঝি,
ছোট ছোট রঙীন জামা জুতো
কিনে এনে বল্‌বে আমায় "পর" !
আমি বল্‌ব "দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মত বড়।
দেখ্‌চ না কি যে-ছোট মাপ জামার—
পর্‌তে গেলে আঁট হবে যে আমার !"

সমালোচক

বাবা না কি বই লেখে সব নিজে,
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে !
সে দিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি বল্ মা সত্যি করে !
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কি হবে ?

তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি
তেমন কেন লেখেননাকো উনি ?
ঠাকুরমা কি বাবাকে কখ্‌খনো
রাজার কথা শোনায়নিকো কোনো ?
সে সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি ?

স্নান করতে বেলা হ'ল দেখে
তুমি কেবল যাও মা ডেকে ডেকে,—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাক,
সে কথা তাঁর মনেই থাকেনাক !
করেন সারাবেলা
লেখা-লেখা খেলা !

শিশু

বাবার ঘরে আমি খেল্‌তে গেলে
তুমি আমায় বল, দুষ্টু ছেলে!
বকো আমায় গোল কর্‌লে পরে—
"দেখ্‌চিস্‌ নে লিখ্‌চে বাবা ঘরে!"
বল্‌ত, সত্যি বল্‌,
লিখে কি হয় ফল!

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে' দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র
আমার বেলা কেন মা রাগ কর?
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে!

বড় বড় রুলকাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ?
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অম্‌নি বল—নষ্ট কর্‌তে নাই!
সাদা কাগজ, কালো
করলে বুঝি ভালো?

বীরপুরুষ

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্চি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্চ পাল্কীতে মা চড়ে'
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,'
আমি যাচ্চি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধূলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে!

সন্ধ্যে হ'ল সূর্য্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদীঘির মাঠে!
ধূধূ করে যে দিক্ পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ, ভাব্‌চ এলেম কোথা!
আমি বল্‌চি ভয় কোরো না মাগো
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা!

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরুবাছুর নেইক কোনোখানে,
সন্ধ্যে হ'তেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্চি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বল্লে আমায় ডেকে
"দীঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো!"

এমন সময় "হাঁরে রে রে রে রে,"
ঐ যে কারা আস্‌তেছে ডাক ছেড়ে ;-
তুমি ভয়ে পাল্কীতে এক কোণে
ঠাকুর্‌ দেব্‌তা স্মরণ কর্‌চ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কী ছেড়ে কাঁপ্‌চে থরোথরো!
আমি যেন তোমায় বল্‌চি ডেকে
আমি আছি ভয় কেন মা করো।

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।

বীরপুরুষ

আমি বলি "দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার
টুক্‌রো করে' দেবো তোদের সেরে!"
শুনে তা'রা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "হাঁরে রে রে রে রে!"

তুমি বল্লে "যাস্‌নে খোকা ওরে,"
আমি বলি "দেখ না চুপ্ করে'!"
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কি ভয়ানক লড়াই হ'ল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা!
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা!

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে'
ভাব্‌চ খোকা গেলই বুঝি মরে!
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বল্‌চি এসে "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে।

বল্‌চ "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কি দুর্দ্দশাই হ'ত তা না হ'লে!"

রোজ্ কত কি ঘটে যাহা-তাহা,
এমন কেন সত্যি হয় না আহা!
ঠিক যেন এক গল্প হ'ত তবে,
শুন্‌ত যারা অবাক্ হ'ত সবে,
দাদা বল্‌ত "কেমন করে' হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে?"
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে!"

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে ত !
সে বাড়ি কি থাক্‌ত, যদি লোক জান্‌তে পেত ?
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে শাদা হাতীর দাঁত।
সাতমহলা কোঠা সেথা থাকেন সুয়োরাণী,
সাত-রাজার-ধন-মাণিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্‌ মা কানে কানে-
ছাদের পাশে তুলসিগাছের টব্‌ আছে যেইখানে !

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাতসাগরের পারে
আমি ছাড়া আর কেহ ত পায় না খুঁজে তা'রে !
দু'হাতে তা'র কাঁকণ দুটি, দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তা'র যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে,
হাসিতে তা'র মাণিকগুলি পড়বে ঝরে' ভুঁয়ে !
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা—শোন্‌ মা কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসিগাছের টব্‌ আছে যেইখানে !

শিশু

তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হ'লে
আমি তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে' !
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা যেই কোণে,
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে !
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সে-ও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে !
জানিস্ নাপিতপাড়া কোথায়—শোন্ মা কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসিগাছের টব্ আছে যেইখানে !

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছা করে
নদীটির ঐ পারে,—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হ'য়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে ;
জাল টেনে নেয় জেলে ;
গোরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধ্যে হ'লে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে ;
শুধু রাতদুপরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার পরে।
মা, যদি হও রাজি
বড় হ'লে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি !

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মত।
বর্ষা হ'লে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখি যত।
তারি ধারে ঘন হ'য়ে
জন্মেছে সব শর,
মাণিকজোড়ের ঘর।
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।
সন্ধ্যা হ'লে কত দিন মা
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি এক মনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে
মা, যদি হও রাজি
বড় হ'লে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি!

এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।

যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখ্‌বে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য্য যখন উঠ্‌বে মাথায়
অনেক বেলা হ'লে—
আস্‌ব তখন চলে'
"বড় ক্ষিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও মা" বলে' !
আবার আমি আসব ফিরে,
আঁধার হ'লে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে !
বাবার মত যাব না মা
বিদেশে কোন্ কাজে !
মা, যদি হও রাজি
বড় হ'লে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি !

———

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের হাটে,
কারো কোনো কাজে লাগ্‌ছে না ত
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে
আমায় যদি দেয় তা'রা নৌকাটি,
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছ—টা
মিথ্যে ঘুরে বেড়াইনাকো হাটে !
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার !

তখন তুমি কেঁদো না মা যেন
বসে' বসে' একলা ঘরের কোণে,
আমি ত মা যাচ্চিনেক চলে'
রামের মত চোদ্দবছর বনে !
আমি যাব রাজপুত্র হ'য়ে
নৌকো ভরা সোনামানিক ব'য়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা তিনজনে !

নৌকাযাত্রা

আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার !

ভোরের বেলা দেব' নৌকো ছেড়ে
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় যাব ভেসে !
তুপুর বেলা তুমি পুকুর ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপূর্ণির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে,
গল্প বল্‌ব তোমার কোলে এসে !
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার !

ছুটির দিনে

ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো ;
আজ্‌কে আমার ছুটোছুটি
লাগ্‌ল না আর ভালো !
ঘণ্টা বেজে গেল কখন্‌
অনেক হ'ল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে' গেল
ফেলে এলেম খেলা !
আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি !
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি !
দ্বারের কাছে এইখানে বোস্‌
এই হেথা চৌকাঠ !
বল্‌ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ !

ঐ দেখ মা বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে !

ছুটির দিনে

দেবতা যখন ডেকে ওঠে,—
থরথরিয়ে কেঁপে
ভয় কর্‌তেই ভালবাসি
তোমায় বুকে চেপে !
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুন্‌তে ভালবাসি
বসে' কোণের ঘরে।
ঐ দেখ মা জান্‌লা দিয়ে
আসে জলের ছাঁট,
বল্ গো আমায়, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ !

কোন্ সাগরের তীরে মাগো
কোন্ পাহাড়ের পারে,
কোন্ রাজাদের দেশে মাগো
কোন্ নদীটির ধারে !
কোনোখানে আল বাঁধা তা'র
নাই ডাইনে বাঁয়ে ?
পথ দিয়ে তা'র সন্ধ্যেবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে ?

শিশু

সারাদিন কি ধূধূ করে

শুক্‌নো ঘাসের জমি ?

একটি গাছে থাকে শুধু

ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি ?

সেখান দিয়ে কাঠকুড়নি

যায় না নিয়ে কাঠ ?

বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে

তেপান্তরের মাঠ ?

এম্‌নিতর মেঘ করেছে

সারা আকাশ ব্যেপে,

রাজপুত্তুর যাচ্চে মাঠে

একলা ঘোড়ায় চেপে !

গজমোতির মালাটি তা'র

বুকের পরে নাচে,

রাজকন্যা কোথায় আছে

খোঁজ্‌ পেলে কার কাছে ?

মেঘে যখন ঝিলিক্‌ মারে

আকাশের এক কোণে

দুয়োরাণী-মায়ের কথা

পড়ে না তা'র মনে ?

ছুটির দিনে

দুখিনী মা গোয়াল ঘরে
দিচ্চে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্‌
তেপান্তরের মাঠ ?

ঐ দেখ মা গাঁয়ের পথে
লোক নেইক মোটে ;
রাখাল-ছেলে সকাল করে’
ফিরেছে আজ গোঠে।
আজকে দেখ রাত্তির্‌ হ’ল
দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা বসে’ আছে
দাওয়ায় মাদুর পেতে
আজকে আমি লুকিয়েছি মা
পুঁথি পত্তর যত,—
পড়ার কথা আজ বোলো না !
যখন বাবার মত
বড় হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ,—
আজ বল মা কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ !

বনবাস

বাবা যদি রামের মত
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাবচ মনে ?
চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়
জানিনে মা ঠিক্,
দণ্ডকবন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক্ !
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করি না তা'তে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর,
সাম্‌নে দিয়ে বইত নদী
পড়্‌ত বালির চর

ছোট একটি থাক্‌ত ডিঙি,
পারে যেতেম বেয়ে—
হরিণ চরে' বেড়ায় সেথা,
কাছে আস্‌ত ধেয়ে।
গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম
আমি নিজের হাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !

কত যে গাছ ছেয়ে থাক্‌ত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে পরে' নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুড়ি ভরে ভরে এনে
ঘরে দিতেম রেখে ;
ক্ষিদে পেলে দুইভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !

শিশু

রোদের বেলায় অশথ তলায়
ঘাসের পরে আসি
রাখাল-ছেলের মত কেবল
বাজাই বসে' বাঁশি।
ডালের পরে ময়ূর থাকে
পেখম পড়ে ঝুলে,
কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়ায়
ন্যাজটি পিঠে তুলে!
কখন্ আমি ঘুমিয়ে যেতেম
দুপুরবেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!

সন্ধ্যেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে' থাকি
আগুন হ'লে জ্বালা।
পাখীরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধ্যে-তারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

মায়ের কথা পড়ত মনে
বসে' আঁধার রাতে,–
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !

ঠাকুরদাদার মত বনে
আছেন ঋষি মুনি
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে
গল্প অনেক শুনি।
রাক্ষসেরে ভয় করিনে
আছে গুহক মিতা,
রাবণ আমার কি করবে মা
নেই ত আমার সীতা !
হনুমানকে যত্ন করে'
খাওয়াই দুধে ভাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !

মাগো আমায় দেনা কেন
একটি ছোট ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা
বনে চলে' যাই !

শিশু

আমাকে মা শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার-গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো,
হাতে ধনুকবাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এম্‌নি বরষাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!

জ্যোতিষ-শাস্ত্র

আমি শুধু বলেছিলেম—
"কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা-চাঁদ আট্‌কা পড়ে
যখন সন্ধ্যেকালে
তখন কি কেউ তা'রে
ধরে' আন্‌তে পারে ?"
শুনে দাদা হেসে কেন
বল্লে আমায় "খোকা
তোর মতন দেখি নেইক বোকা !
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে
কেমন করে' ছুঁই ?"
আমি বলি "দাদা তুমি
জান না কিচ্ছুই !
মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জান্‌লার ফাঁকে
তখন তুমি বল্‌বে কি, মা
অনেক দূরে থাকে ?"
তবু দাদা বলে আমায় "খোকা,
তোর মতন দেখি নেই ত বোকা !"

শিশু

দাদা বলে, "পাবি কোথায়
অত বড় ফাঁদ ?"
আমি বলি, "কেন দাদা
ঐ ত ছোট চাঁদ,
দুটি মুঠোয় ওরে
আন্‌তে পারি ধরে' !"
শুনে দাদা হেসে কেন
বল্লে আমায় "খোকা,
তোর মতন দেখি নেই ত বোকা !
চাঁদ যদি কাছে আস্‌ত
দেখ্‌তে কত বড় !"
আমি বলি, কি তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড় !
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নীচু
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড় কিছু ?"
তবু দাদা বলে আমায় "খোকা,
তোর মতন দেখি নেই ত বোকা !"

বৈজ্ঞানিক

যেম্‌নি মাগো গুরুগুরু

মেঘের পেলে সাড়া,

যেম্‌নি এল আষাঢ়মাসে

বৃষ্টিজলের ধারা,

পূবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে

যেমনি পড়ল আসি

বাঁশবাগানে সোঁ সোঁ করে'

বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি—

অম্‌নি দেখ্‌ মা চেয়ে

সকল মাটি ছেয়ে

কোথা থেকে উঠ্‌ল যে ফুল

এত রাশি রাশি !

তুই যে ভাবিস্‌ ওরা কেবল

অম্‌নি যেন ফুল,

আমার মনে হয় মা তোদের

সেটা ভারি ভুল !

শিশু

ওরা সব ইস্কুলের ছেলে
পুঁথিপত্র কাঁখে,
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।
ওরা পড়া করে
দুয়োর-বন্ধ ঘরে,
খেল্‌তে চাইলে, গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে!

বশেখ জষ্ঠি মাসকে ওরা
দুপুরবেলা কয়,
আষাঢ় হ'লে আঁধার করে'
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে!
অম্‌নি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হল্‌দে রাঙা সবুজ শাদা
কত রকম সাজে!

বৈজ্ঞানিক

জানিস্ মাগো ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি
রাত্রে যেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।
দেখিস্‌নে মা বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত!
বুঝতে পারিস্ কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত?
জানিস্ কি কার কাছে
হাত বাড়িয়ে আছে?
মা কি ওদের নেইক ভাবিস্
আমার মায়ের মত?

মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তা'রা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে
বলে "আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যেবেলা !
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রূপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে' !"
আমি বলি "যাব কেমন করে' ?"
তা'রা বলে "এস মাঠের শেষে !
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে
আমরা তোমায় নেব' মেঘের দেশে !"

আমি বলি "মা যে আমার ঘরে
বসে' আছে চেয়ে আমার তরে,
তা'রে ছেড়ে থাক্‌ব কেমন করে' ?"
শুনে তা'রা হেসে যায় মা ভেসে !
তা'র চেয়ে মা আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ,
দু-হাত দিয়ে ফেল্‌ব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ !

ঢেউয়ের মধ্যে মাগো যারা থাকে,
তা'রা আমায় ডাকে আমায় ডাকে !
বলে "আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান !"

তা'রা বলে "কোন্‌দেশে যে ভাই
আমরা চলি ঠিকানা তা'র নাই !"
আমি বলি "কেমন করে' যাই ?"
তা'রা বলে "এস ঘাটের শেষে !
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোক বুজে
আমরা তোমার নেব' ঢেউয়ের দেশে !"
আমি বলি "মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধ্যে হ'লে নাম ধরে' মোর ডাকে,
কেমন করে' ছেড়ে থাক্‌ব তা'কে !"
শুনে তা'রা হেসে যায় মা ভেসে !
তা'র চেয়ে মা আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ !
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।

———

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি করে'
চাঁপার গাঁছে চাঁপা হ'য়ে ফুটি
ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,

তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিন্‌তে আমায় পারো ?
তুমি ডাক "খোকা কোথায় ওরে !"
আমি শুধু হাসি চুপ্‌টি করে' !

তখন তুমি থাক্‌বে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখ্‌ব নয়ন মেলে !
স্নানটি করে' চাঁপার তলা দিয়ে
আস্‌বে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে ;—

এখান দিয়ে পূজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে ;
তখন তুমি বুঝ্‌তে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে

লুকোচুরি

দুপুর বেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হ'লে ;—
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়্‌বে এসে তোমার পিঠে কোলে ;-

আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের পরে আনি!
তখন তুমি বুঝতে পার্‌বে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে !

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ করিয়ে পড়ব ভুঁয়ে ঝরে' !

আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বল" তোমায় গিয়ে কব !
তুমি বল্‌বে "দুষ্টু ছিলি কোথা !"
আমি বল্‌ব "বল্‌ব না সে কথা !"

দুঃখহারী

মনে কর তুমি থাক্‌বে ঘরে
আমি যেন যাব দেশান্তরে !
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী,
জিনিষপত্র নিয়েছি সব ভরি',
ভালো করে' দেখ্‌ ত মনে করি
কি এনে মা দেব তোমার তরে !

চাস্‌ কি মা তুই এত এত সোনা ?
সোনার দেশে করব আনাগোনা !
সোনামতী নদী-তীরের কাছে
সোনার ফসল মাঠে ফলে' আছে,
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে,
না কুড়িয়ে আমি ত ফিরব না !

পর্‌তে কি চাস্‌ মুক্তো গেঁথে হারে ?
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর পারে !
সেখানে মা সকালবেলা হ'লে
ফুলের পরে মুক্তোগুলি দোলে,
টুপটুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে,
যত পারি আন্‌ব ভারে ভারে !

দাদার জন্যে আন্‌ব মেঘে-ওড়া
পক্ষীরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আন্‌বো আমি তুলি
কনকলতার চারা অনেকগুলি ;—
তোর তরে মা দেব' কৌটা খুলি'
সাত-রাজার-ধন মাণিক একটি জোড়া!

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই !
ভোরের বেলা শূন্যকোলে
ডাক্‌বি যখন খোকা বলে'
বল্‌ব আমি—নাই সে খোকা নাই !
মাগো যাই !

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে
যাব মা তোর বুকে ব'য়ে
ধর্‌তে আমায় পারবিনে ত হাতে।
জলের মধ্যে হব মা ঢেউ
জান্‌তে আমায় পার্‌বে না কেউ,
স্নানের বেলা খেল্‌ব তোমার সাথে।

বাদ্‌লা যখন পড়্‌বে ঝরে'
রাতে শুয়ে ভাব্‌বি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জান্‌লা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক্‌ মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়্‌বে কি তোর মনে.

খোকার লাগি তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হয়ে বল্‌ব তোমায় "ঘুমো"।

বিদায়

তুই ঘুমিয়ে পড়্‌লে পরে
জ্যোৎস্না হ'য়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো !
স্বপন হ'য়ে আঁখির ফাঁকে
দেখতে আমি আস্‌ব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখ্‌বে পাশে
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে !
পূজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে—খোকা নেই রে ঘরের মাঝে !
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে !
পূজোর কাপড় হাতে করে'
মাসি যদি শুধায় তোরে
"খোকা তোমার কোথায় গেল চলে ?"
বলিস্‌ খোকা সে কি হারায় !
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে !

নদী

ওরে তোরা কি জানিস্ কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ !
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে ?
শোন চলচল ছলছল
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে বসে' দুলে ?
সদা হেসে করে লুটোপুটি
চলে কোন্ খানে ছুটোছুটি,
ওরা সকলের মন তুষি'
আছে আপনার মনে খুসি।

আমি বসে' বসে' তাই ভাবি,
নদী কোথা হ'তে এল নাবি' !
কোথায় পাহাড় সে কোন্খানে
তাহার নাম কি কেহই জানে ?
কেহ যেতে পারে তা'র কাছে
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে ?

নদী

সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস
নাহি পশু পাখীদের বাস,
সেথা শবদ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে' আছে মহামুনি।
তাহার মাথার উপরে শুধু
শাদা বরফ করিছে ধূধূ।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মত।
শুধু হিমের মতন হাওয়া,
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া,
শুধু সারারাত তারাগুলি
তা'রে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তা'রে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা শাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমাইতেছিল সুখে।
কবে মুখে তা'র রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে ;

শিশু

কবে	একদা রোদের বেলা
তাহার	মনে পড়ে গেল খেলা
সেথায়	একা ছিল দিন রাতি,
কেহই	ছিল না খেলার সাথী ;
সেথায়	কথা নাই কারো ঘরে,
সেথায়	গান কেহ নাহি করে।
তাই	ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী	বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে	ভাবিল, যা আছে ভবে
সকলি	দেখিয়া লইতে হবে।

নীচে	পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ	উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তা'রা	বুড়ো বুড়ো তরু যত,
তাদের	বয়স কে জানে কত ;
তাদের	খোপে খাপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখী	বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তা'রা	ডাল তুলে কালো কালে
আড়াল	করেছে রবির আলো।
তাদের	শাখায় জটার মত
ঝুলে	পড়েছে শ্যাওলা যত ;

তা'রা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলিখিলি।
তা'রে কে পারে রাখিতে ধরে'
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে'।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।

পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে,
নদী হেসে যায় বেঁকে চুরে।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তা'রা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতনতরো,
তাদের শরীর কঠিন বড়।
তাদের চোখদুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা।

শিশু

তা'রা　　পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই　　কাজ করে গান গেয়ে।
তা'রা　　সারা দিনমান খেটে,
আনে　　বোঝাভরা কাঠ কেটে।
তা'রা　　চড়িয়া শিখর পরে
বনের　　হরিণ শিকার করে।

নদী　　যত আগে আগে চলে
ততই　　সাথী জোটে দলে দলে।
তা'রা　　তারি মত, ঘর হ'তে
সবাই　　বাহির হয়েছে পথে ;
পায়ে　　ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন　　বাজিতেছে মল চুড়ি ;
গায়ে　　আলো করে ঝিকিঝিক্
যেন　　পরেছে হীরার চিক্।
মুখে　　কলকল কত ভাষে,
এত　　কথা কোথা হ'তে আসে
শেষে　　সখীতে সখীতে মেলি
হেসে　　গায়ে গায়ে পড়ে হেলি।
শেষে　　কোলাকুলি কলরবে
তা'রা　　এক হ'য়ে যায় সবে।

তখন্ কল কল ছুটে জল,
কাঁপে টলমল ধরাতল ;
কোথাও নীচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর,
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড় বড়
তা'রা হ'য়ে পড়ে পড়-পড়।
কত বড় পাথরের চাপ
জলে খসে' পড়ে ঝুপ ঝাপ,
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মত ছোটে।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারিদিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথ ঘাট !

শিশু

কোথাও চাষীরা করিছে চাষ ;
কোথাও গরুতে খেতেছে ঘাস ;
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখী শিষ্ দিয়ে দিয়ে নাচে ;
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে ;
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান্ কাজে।
কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে ববষার জলধারা
আসে চারিদিক্ হ'তে তা'রা।
নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে
এখন্ কে রাখে ধরিয়া তা'রে ?

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।
সেথা মহিষের দল থাকে,
তা'রা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তা'রা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।

সেথা	শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে	হুয়া হুয়া করে' ডাকে।
দেখে	এই মত কত দেশ,
কেবা	গণিয়া করিবে শেষ।
কোথাও	কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও	মাটিগুলো রাঙা রাঙা,
কোথাও	ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও	দু-ধারে গমের ক্ষেত,
কোথাও	ছোটখাটো গ্রামখানি,
কোথাও	মাথা তোলে রাজধানী।
সেথায়	নবাবের বড় কোঠা,
তারি	পাথরের থাম মোটা,
তারি	ঘাটের সোপান যত,
জলে	নামিয়াছে শত শত।
কোথাও	শাদা পাথরের পুলে
নদী	বাঁধিয়াছে দুই কূলে।

কোথাও	লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে	ধকো-ধকো ডাক ছাড়ি
নদী	এই মত অবশেষে
এল	নরম মাটির দেশে।

হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তা'রি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে।
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে ;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল ;
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়াতরী দেয় পাড়ি।

কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু'বেলা সকালে সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাই-মাখা
ঘাটে বসে' আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট ;
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট ;
মাঠে কলাই শরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ ;

নদী

কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিখ্ চরিছে আপন মনে।
কোথাও ধূধূ করে বালুচর
সেথায় গাঙ্‌শালিখের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে' আসে চলে'।
সেথায় শীত কালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।
কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে,
ঘন আম-কাঁঠালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলা-ভরা
সেথা খড়গুলা রাশ করা;
সেথা গোয়ালেতে গরু বাঁধা
কত কালো পাটকিলে শাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় কঁ্যা কঁ্যা করে' ঘোরে ঘানি

শিশু

কোথাও　　কুমারের ঘরে চাক্
দেয়　　সারাদিন ধরে' পাক।
মুদী　　দোকানেতে সারাখণ
বসে'　　পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথাও　　বসি পাঠশালা ঘরে
যত　　ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে।
বড়　　বেতখানি ল'য়ে কোলে
ঘুমে　　গুরু মহাশয় ঢোলে।
হোথায়　　এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে
গ্রামের　　পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায়　　বোঝাই গরুর গাড়ি
ধীরে　　চলিয়াছে ডাক ছাড়ি।
রোগা　　গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায়　　শুঁকিয়া বেড়ায় ধূলো।

যেদিন　　পূরণিমা রাতি আসে
চাঁদ　　আকাশ জুড়িয়া হাসে;
বনে　　ও-পারে আঁধার কালো,
জলে　　ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি　　চিকিচিকি করে চরে
ছায়া　　ঝোপে বসি' থাকে ডরে।

সবাই ঘুমায় কুটীরতলে
তরী একটিও নাহি চলে ;
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু ঘুম যদি যায় ছুটে',
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু ও-পারে চরের পাখী
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি'।
নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।

হোথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ্ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপেঝাপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতা বাঘ
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।
রাতে চুপি চুপি আসি' ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে ;
তখন কানায় কানায় জল,
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে উঠে খল খল,
তরী করি ওঠে টলমল।
নদী অজগর সম ফুলে'
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে'
তখন জল যায় সরে' সরে',
তখন নদী রোগা হ'য়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে ;
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেমন বুকের হাড়ের মত।

নদী চলে' যায় যত দূরে
ততই জল উঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক্ হ'য়ে যায় ভুল ;
নীল হ'য়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা ;

ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল ;
ডাঙা কোন্ খানে পড়ে' রয়,
শুধু জলে জলে জলময়।

ওরে, এ কি শুনি কোলাহল,
হেরি এ কি ঘন নীল জল !
ওই বুঝিরে সাগর হোথা,
উহার কিনারা কে জানে কোথা !
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে'
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে'।
ওঠে শাদা শাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মত।
জল গরজি গরজি ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হ'তে আসে ছুটে',
ঢেউয়ে হাহা করে' পড়ে লুটে'।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে' লাফায়ে বেড়ায় খেলে'।

হেথা যতদূর পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই।

শিশু

শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,
শুধু ফেনা, আর শুধু ঢেউ,
আর নাহি কিছু নাহি কেউ !
হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ,
হেথা সারাদিন সারাবেলা
তাহার ফুরাবে না আর খেলা।
তাহার সারাদিন নাচ গান
কভু হবেনাক অবসান।
এখন্ কোথাও হবে না যেতে
সাগর নিল তা'রে বুক পেতে
তা'রে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার কাদামাটি দিবে ধুয়ে।
তা'রে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তা'রে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তা'র কানে কানে গেয়ে সুর
তা'র শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
র'বে অতল আদরে মিশি !

নবীন অতিথি

(গান)

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি, নূতন কি তুমি চিরন্তন ?
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন !
যতনে কত কি আনি
বেঁধেছিনু গৃহখানি
হেথা কে তোমারে বল করেছিল নিমন্ত্রণ ?
কত আশা ভালবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে
একটি না কহি বাণী
তুমি এলে মহারাণী,
কেমনে গোপন মনে করিলে হে পদার্পণ ?

অস্তসখী

রজনী একাদশী
পোহায় ধীরে ধীরে,
রঙীন্ মেঘমালা
উষারে বাঁধে ঘিরে।
আকাশে ক্ষীণশশী
আড়ালে যেতে চায়,
দাঁড়ায়ে মাঝখানে
কিনারা নাহি পায়!

এ হেনকালে, যেন
মায়ের পানে মেয়ে
রয়েছে শুকতারা
চাঁদের মুখে চেয়ে।
কে তুমি মরি মরি
একটুখানি প্রাণ!
এনেছ কি না জানি
করিতে ওরে দান!

মহিমা যত ছিল
উদয়বেলাকার
যতেক সুখসাথী
এখনি যাবে যার,
পুরানো সব গেল,—
নূতন তুমি একা
বিদায়কালে তা'রে
হাসিয়া দিলে দেখা!

ও চাঁদ যামিনীর
হাসির অবশেষ,
ও শুধু অতীতের
সুখের স্মৃতিলেশ,
তাহারা দ্রুতপদে
কোথায় গেছে সরে',
পারেনি সাথে যেতে
পিছিয়ে আছে পড়ে'!

তাদেরি পানে ও যে
নয়ন ছিল মেলি,
তাদেরি পথে ও যে
চরণ ছিল ফেলি,

এমন সময়ে কে
ডাকিলে পিছু পানে
একটি আলোকেরি
একটু মৃদু গানে !

গভীর রজনীর
রিক্ত ভিখারীকে
ভোরের বেলাকার
কি লিপি দিলে লিখে ?
সোনার-আভা-মাখা
কি নব আশাখানি
শিশির-জলে ধুয়ে
তাহারে দিলে আনি !

অস্ত উদয়ের
মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন নবীনেরে
টানিছ ভালবেসে ;—
বধূ ও বররূপে
করিলে এক-হিয়া
করুণ কিরণের
গ্রন্থি বাঁধি দিয়া !

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি
পল্লীটি তা'র দখলে,
সবাই তারি পূজো জোগায়
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায়
কথায় যদি মন দেহ—
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে
আছে আমার সন্দেহ!
ভোরের বেলা আঁধার থাকে,
ঘুম যে কোথা ছোটে ওর,-
বিছানাতে হুলুস্থূলু
কলরবের চোটে ওর!
খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু
পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি করে' পালাতে যায়
মায়ের কোলে না গিয়ে।
হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়,
আমি তখন নাচারী,
কাঁধের পরে তুলে তা'রে
করে' বেড়াই পা-চারী।

শিশু

মনের মত বাহন পেয়ে
ভারি মনের খুসিতে
মারে আমায় মোটা মোটা
নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হ'য়ে বলি—
"একটু রোস রোস মা!"
মুঠো করে' ধর্‌তে আসে
আমার চোখের চষমা!
আমার সঙ্গে কলভাষায়
করে কতই কলহ!
তুমুল কাণ্ড! তোমরা তা'রে
শিষ্ট আচার বলহ?
তবু ত তা'র সঙ্গে আমার
বিবাদ করা সাজে না!
সে নৈলে যে তেমন করে'
ঘরের বাঁশি বাজে না!
সে না হ'লে সকাল বেলায়
এত কুসুম ফুট্‌বে কি?
সে না হ'লে সন্ধ্যেবেলায়
সন্ধ্যেতারা উঠ্‌বে কি?
একটি দণ্ড ঘরে আমার
না যদি রয় দুরন্ত

পরিচয়

কোনোমতে হয় না তবে
বুকের শূন্য-পূরণ ত।
দুষ্টুমি তা'র দখিন হাওয়া
সুখের তুফান-জাগানে,
দোলা দিয়ে যায় গো আমার
হৃদয়ের ফুলবাগানে !

নাম যদি তা'র জিগেস কর
সেই আছে এক ভাবনা,
কোন্ নামে যে দিই পরিচয়
সে ত ভেবেই পাব না !
নামের খবর কে রাখে ওর
ডাকি ওরে যা' খুসি,
দুষ্টু বল দস্যি বল
পোড়ারমুখী রাক্ষুসি !
বাপমায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপমায়েরি থাক্ সে নয়,
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন্ বাক্সে নয় !

একজনেতে নাম রাখবে
কখন্ অন্নপ্রাশনে,

শিশু

বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
ভারি বিষম শাসন এ !
নিজের মনের মত সবাই
করুন্ কেন নামকরণ,
বাবা ডাকুন্ চন্দ্রকুমার,
খুড়ো ডাকুন্ রামচরণ !
ঘরের মেয়ে তা'র কি সাজে
সংস্কৃত নামটা ঐ !
এতে কারো দাম বাড়ে না
অভিধানের দামটা বই ।
আমি বাপু ডেকেই বসি
যেটাই মুখে আসুক্ না ;
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসুক্ না ;
একটি ছোট মানুষ, তাঁহার
একশো রকম রঙ্গ ত !
এমন লোককে একটি নামেই
ডাকা কি হয় সঙ্গত ?

বিচ্ছেদ

বাগানে ঐ দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে কত যে !
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ছিল ফুলের মত যে !
ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে
আপন সুধা মাখায়ে,
সকাল হ'ত সকাল বেলায়
যাহার পানে তাকায়ে !
সেই আমাদের ঘরের মেয়ে
সে গেছে আজ প্রবাসে,
নিয়ে গেছে এখান থেকে
সকাল বেলার শোভা সে !
একটুখানি মেয়ে আমার
কত যুগের পুণ্য যে !
একটুখানি সরে' গেছে,
কতখানিই শূন্য যে !

বিষ্টি পড়ে টুপুর টুপর,
মেঘ করেছে আকাশে,
ঊষার রাঙা মুখখানি আজ
কেমন যেন ফ্যাকাসে !

শিশু

বাড়িতে যে কেউ কোথা নাই,
দুয়োরগুলো ভ্যাজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন!
ময়নাটি ঐ চুপ্‌টি করে'
ঝিমচ্চে সেই খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তা'র নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পড়ে' বিছানা,
কার তরে সে কেঁদে মরে—
সে কল্পনা মিছে না!
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে
নাম লেখা তায় কার গো?
এমনি্ তা'রা র'বে কি হায়,
খুল্‌বে না কেউ আর গো?
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেই ত,—
স্মরণ করে' দেয় রে যারে
থাকেনাক সেই ত!

উপহার

স্নেহ উপহার এনে দিতে চাই,
কি যে দিব তাই ভাবনা,
যত দিতে সাধ করি মনে মনে
খুঁজেপেতে সে ত পাব না!
আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে
সবাই করেছে একতা,
বাকি যে এখন আছে কত ধন
না তোলাই ভালো সে কথা!
সোনা রূপো আর হীরে জহরৎ
পোঁতা ছিল সবি মাটিতে,
জহরী যে যত সন্ধান পেয়ে
নে' গেছে যে যার বাটীতে!
টাকাকড়ি মেলা আছে ট্যাঁকশালে
নিতে গেলে পড়ি বিপদে।
বসন ভূষণ আছে সিন্দুকে,
পাহারাও আছে ফি পদে।

শিশু

এ যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড় বিষম দেশ রে !
ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে দূরে চলে' গিয়ে
ভুলে গিয়ে সব শেষ রে !
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন
যে যাহারে পারে দেয় যে !
তাও কত থাকে কত ভেঙে যায়
কত মিছে হয় ব্যয় যে !
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত,
চোখে যদি দেখা যেত রে,
কতগুলো তবে জিনিষ পত্র
বল্ দেখি দিত কে তোরে ?
তাই ভাবি মনে কি ধন আমার
দিয়ে যাব তোরে নুকিয়ে,
খুসি হবি তুই খুসি হব আমি
বাস্ সব যাবে চুকিয়ে।
কিছু দিয়ে থুয়ে চিরদিন তরে
কিনে রেখে দেব' মন তোর
এমন আমার মন্ত্রণা নেই,
জানিনেও হেন মন্তর !
নবীন জীবন, বহুদূর পথ
পড়ে' আছে তোর সুমুখে ;

স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই
পিয়ে নিস্ এক চুমুকে ;
সাথীদলে জুটে চলে' যাস্ ছুটে,
নব আশে নব পিয়াসে,
যদি ভুলে যাস্ সময় না পাস্,
তাহাতে কি যায় কি আসে !
মনে রাখিবার চির অবকাশ
থাকে আমাদেরি বয়সে,
বাহিরেতে যার না পাই নাগাল
অন্তরে জেগে রয় সে !

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী
আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে
যায় চলে' দেশ বিদেশে ;-
যার কোল হতে ঝরণার স্রোতে
এসেছে আদরে গলিয়া,
তা'রে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে
অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোট নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে,—

যতদূরে যায় স্নেহধারা তা'র
সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাক নাই থাক
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিষ-ঝরণা।

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই
আনন্দে দুহাত তুলি নাচে।

পিতা বসি ছিল দ্বারে দুজনে শুধাল তা'রে—
কি পোষাক আনিয়াছ কিনে ?
পিতা কহে—আছে, আছে, তোদের মায়ের কাছে
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।

সবুর সহে না আর জননীরে বারবার
কহে, মাগো ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কি কিনে এনেছে ঘরে
একবার দেনা মা দেখায়ে !

ব্যস্ত দেখি' হাসিয়া মা দু'খানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।

মধু কহে—আর নেই ? মা কহিল, আছে এই
এক জোড়া ধুতি ও চাদর।

রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধূলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, চাহি না মা,
রায় বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা !

মা কহিল, মধু ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি,
গরীব যে তোমাদের বাপ,
এবার হয়নি ধান কত গেছে লোক্‌সান
পেয়েছেন কত দুঃখ তাপ !

তবু দেখ বহু ক্লেশে তোমাদের ভালবেসে
সাধ্যমত এনেছেন কিনে,
সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির পরে
এই শিক্ষা হ'ল এতদিনে !

বিধু বলে, এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর
এই জামা পরাস্‌ আমারে !
মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায় বাবুদের দ্বারে।

সেথা মেলা লোক জড়, রায় বাবু ব্যস্ত বড়
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লান মনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।

কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া—
কি রে মধু হয়েছে কি ! তোরে যে শুকনো দেখি !
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া !

কহিল, আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।
শুনি রায় মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
সেজন্য ভাবনা কিবা তোর !

ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, ওরে গুপি
তোর জামা দে তুই মধুরে।
গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে
হাসি আর নাহি ধরে মুখে !

বুক ফুলাইয়া চলে সবারে ডাকিয়া বলে,
দেখ কাকা, দেখ চেয়ে মামা !

শিশু

ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা !

মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি,
কপালে করিয়া করাঘাত—
হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ
কারো কাছে পাতি নাই হাত !

তুমি আমাদেরি ছেলে ভিক্ষা ল'য়ে অবহেলে
অহঙ্কার কর ধেয়ে ধেয়ে !
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তা'র
ভিক্ষা করা সাটিনের চেয়ে !

আয় বিধু আয় বুকে চুমো খাই চাঁদমুখে
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো !
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো !

কাগজের নৌকা

ছুটি হ'লে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি।
লিখে রাখি তা'তে আপনার নাম
লিখি আমাদের বাড়ী কোন্ গ্রাম,
বড় বড় করে' মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি,
কার কাছ হ'তে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি।

আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুলে ভরি'।
বাড়ীর বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকাল বেলায়,
শিশিরের জল করে ঝলমল্
প্রভাতের আলো পড়ি'!
সেই কুসুমের অতি ছোট বোঝা
কোন্ দিক পানে চলে' যায় সোজা,

শিশু

বেলা-শেষে যদি পার হ'য়ে নদী
ঠেকে কোনোখানে যেয়ে—
প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে।

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি' তীরে।
ছোট ছোট ঢেউ উঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখী চলে' যায় ডাকি',
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোট নৌকার মত,
কে ভাসালে তা'য়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে ;
ঐ মেঘ আর, তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে ?

বেলা হলে শেষে বাড়ী থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি'।
আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি,

কাগজের নৌকা

কোথা কোন্ গাঁয় ভেসে চলে' যায়
আমার নৌকাখানি !
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তা'রে কভু নাহি করে মানা,
ধরে' নাহি রাখে, ফিরে' নাহি ডাকে,
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি পরে চড়ি'
মন যায় ভেসে ভেসে।

রাত হ'য়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে ;
চোখ বুজে ভাবি,—এমন আঁধার,
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দু'ধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে !
আকাশের তারা মিটিমিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি'।
ঘুম ল'য়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি !

শীত

পাখী বলে, আমি চলিলাম,
ফুল বলে, আমি ফুটিব না ;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না !
কিশলয় মাথাটি না তুলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,'
সায়াহ্ন ধূমল-ঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
পাখী কেন গেল গো চলিয়া ?
কেন ফুল কেন সে ফুটে না ?
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটে না ?
শীতের হৃদয় গেছে চলে',
অসাড় হয়েছে তার মন,
ত্রিবলী-বলিত তা'র ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।

জ্যোৎস্নার যৌবনভরা রূপ,
ফুলের যৌবন পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বাল্য কোলাহল,
সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন বসে' থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখী বলে চলিলাম ;
ফুল বলে আমি ফুটিব না ;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না।
আশা বলে, বসন্ত আসিবে ;
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখী বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে,
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।

শিশু

মনে তা'র শত আশা জাগে,
কি যে চায় আপনি না বুঝে,
প্রাণ তা'র দশ দিকে ধায়,
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল ফুটে তা'রো মুখ ফুটে ;
পাখী গায় সেও গান গায় ;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধরে' দুজনে খেলায়।
তাই শুনি, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব ;
পাখী বলে, আমিও গাহিব ;
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

শীত তুমি হেথা কেন এলে ?
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখী সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার-মরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানী গো কাটায়ো তব দিন

শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি
বাতাস বয়ে' ওড়ে চুল ;
শীত চলে যায়, মারে তার গায়
মোটা মোটা গোটা ফুল।
আঁচল ভরে' গেছে শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা,
শীত বলে, "ভাই এ কেমন খেলা !
যাবার বেলা হ'ল, আসি !"
বসন্ত হাসিয়ে বসন ধরে টানে,
পাগল করে' দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের পরে হানে,
হাসির পরে হানে হাসি।
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপ্ড়ি উড়ে করে যে বিকল,
কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,
ফুলের পরে পড়ে ফুল।
দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ,

কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
হ'য়ে যায় দিক্‌ভুল !
বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টল্‌মল করে রাঙা চরণ ছুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি
বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
বলাবলি করে ডাল-পালাগুলি,
লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি
অঙ্গুলি তুলি' চায়।
রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আসে পাশে হাসে কত জাতি যূথী,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী
বনফুল-বধূগুলি ।
কত পাখী ডাকে কত পাখী গায়,
কিচিমিচি কিচি কত উড়ে যায়,
এ-পাশে ও-পাশে মাথাটি হেলায়,
নাচে পুচ্ছখানি তুলি' ।
শীত চলে' যায়, ফিরে ফিরে চায়,
মনে মনে ভাবে, এ কেমন বিদায়।
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুল ঘায় হার মানে।

শীতের বিদায়

শুক্‌নো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায় হায়,
আপাদমস্তক ঢেকে কোয়াশায়
শীত গেল কোন্ খানে !

———

আকুল আহ্বান

সন্ধ্যে হল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না !
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না !
সময় হ'ল বেঁধে দেব' চুল,
পরিয়ে দেব' রাঙা কাপড়খানি।
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী !

রাত্রি হ'ল, আঁধার করে' আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে !
শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে !

আঁধার রাতে চলে' গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।

আকুল আহ্বান

এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া ?

ফুলের দিনে সে যে চলে' গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে' গেল বন
একটি সে ত পরতে পেল না।
ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে' যায়—
ফুল নিয়ে যে আর সকলেই পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও র'বে না তা'র তরে !

খেল্‌ত যারা তা'রা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা তা'রা আজো হাসে,
তাহার তরে কেউত বসে' নেই
মা কেবল রয়েছে তারি আশে !
হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে !
ব্যর্থ হবে মা'র ভালবাসা !
কত জনের কত আশা পূরে,
ব্যর্থ হবে মা'র প্রাণের আশা !

স্নেহ-স্মৃতি

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কে তোরা আজি এ প্রাতে এনে দিলি মোর হাতে,
জল আসে আঁখিপাতে, হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

কত দিন, কত সুখ, কত হাসি, স্নেহমুখ,
কত কি পড়িল মনে প্রভাত বাতাসে,
স্নিগ্ধ প্রাণ সুধাভরা, শ্যামল সুন্দর ধরা,
তরুণ অরুণরেখা নির্ম্মল আকাশে ;
সকলি জড়িত হ'য়ে অন্তরে যেতেছে ব'য়ে
ডুবে যায় অশ্রুজলে হৃদয়ের কূল,
মনে পড়ে তারি সাথে জীবনের কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

বড় বেসেছিনু ভালো এই শোভা, এই আলো,
এ আকাশ, এ বাতাস, এই ধরাতল!
কতদিন বসি তীরে শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সঙ্গীত তরল ;

স্নেহ-স্মৃতি

কতদিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালা গাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল ;
বড় ভালো লেগেছিল যে দিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল !

কত শুনিয়াছি বাঁশি, কত দেখিয়াছি হাসি,
কত উৎসবের দিনে কত যে কৌতুক ;
কত বরষার বেলা সঘন-আনন্দ মেলা,
কত গানে জাগিয়াছে সুনিবিড় সুখ ;
এ প্রাণ বীণার মত ঝঙ্কারি উঠেছে কত,
আসিয়াছে শুভক্ষণ কত অনুকূল,
মনে পড়ে তারি সাথে কত দিন কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল !

———

শারদোৎসব

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদাদা

লক্ষেশ্বর

উপনন্দ

রাজা

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

শারদোৎসব

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস—একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি!
কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি!

কেয়া পাতায় নৌকো গড়ে'
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তাল দীঘিতে ভাসিয়ে দেব'
চল্‌বে দুলে দুলে!

রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখ্‌ব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি!
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি!

লক্ষেশ্বর

(ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া)

ছেলেগুলো ত জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরধারীলাল! ধর্‌ত ছোঁড়াগুলোকে ধর্‌ত!

ছেলেরা

(দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া)

ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েচে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েচে!

লক্ষেশ্বর

হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাক্‌ড়ে আন্‌ত; একটাকেও ছাড়িস্‌নে!

একজন বালক

(চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া)

কাক লেগেচে লক্ষ্মীপেঁচা,
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা!

লক্ষেশ্বর

হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখবনা !

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা

কি হয়েছে লখা দাদা ! মার-মূর্ত্তি কেন ?

লক্ষেশ্বর

আরে দেখনা ! সক্কাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেচে !

ঠাকুরদাদা

আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না ! গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে ! হায়রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্চেন !

লক্ষেশ্বর

গান গাবার বুঝি সময় নেই ! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে ! আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে !

ঠাকুরদাদা

তা ঠিক ! হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা ! ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায় ! ওরে বাঁদরগুলো, আয় ত রে ! চল্ তোদের পঞ্চানন-তলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা তোমার দপ্তর নিয়ে বস গে ! আর হিসেবে ভুল হবে না !

(ছেলেরা ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া নৃত্য)

প্রথম

হাঁ ঠাকুরদাদা চল !

দ্বিতীয়

আমাদের আজ গল্প বল্‌তে হবে !

তৃতীয়

না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুর্দ্দার পাঁচালি হবে !

চতুর্থ

বটতলায় না, ঠাকুর্দ্দা আজ পারুলডাঙায় চল !

ঠাকুরদাদা

চুপ, চুপ, চুপ ! অমন গোলমাল লাগাস্‌ যদি ত লখা-দাদা আবার ছুটে আস্‌বে !

(লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

কোন্‌ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েচে রে !

(কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান)

(উপনন্দের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

কিরে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ

কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর

মৃত্যু ! মৃত্যু হলে চল্‌বে কেন ? আমার টাকাগুলোর কি হবে ?

উপনন্দ

তাঁর ত কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জ্জন করে' তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর

বীণাটি আছে মাত্র ! কি শুভ সংবাদটাই দিলে !

উপনন্দ

আমি শুভ সংবাদ দিতে আসিনি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেচেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে' আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

বটে ! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মৎলব করেচ ! আমি তত বড় গর্দ্দভ নই। আচ্ছা, তুই কি করতে পারিস্ বল দেখি !

উপনন্দ

আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাইনে। আমি নিজে উপার্জ্জন করে যা পারি খাব—তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

আমাদের বীণকারটিও যেমন নির্ব্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখচি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক একজনের ঐ রকম মরাই স্বভাব।—আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ

নইলে আবার কি! আমাকে ভয় দেখাচ্চ মিছে! আমার কি আছে যে তুমি আমার কিছু করবে! আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে' ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেচি। আমাকে ভয় দেখিয়োনা বল্‌চি!

লক্ষেশ্বর

না না ভয় দেখাব না! তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে! টাকাটা ঠিক মত দিয়ো বাবা! নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে!

(উপনন্দের প্রস্থান)

ঐ যে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই ত আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মৎলবটা কি বল্‌ দেখি!

ধনপতি

ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে—আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর

বেতসিনীর ধারে! ঐরে খবর পেয়েছে বুঝি! বেতসিনীর ধারেইত আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি! (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বলচি, সে সব না! চল্ শীঘ্র চল্, নামতা মুখস্থ করতে হবে!

ধনপতি

(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর

দিন আবার সুন্দর কি রে! এই রকম বুদ্ধি মাথায় ঢুক্‌লেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি! যা বল্‌চি ঘরে যা! (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারিনে। মনে করচি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়! যাই হোক্, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে আস্‌তে হচ্চে! ছোঁড়াগুলো খবর পায়নি ত! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব! সব জিনিষ খুঁড়ে বের করে ফেলে—কোনো জিনিষের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালবাসে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর—বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক

ঠাকুর্দ্দা, তুমি আমাদের দলে!

দ্বিতীয় বালক

না ঠাকুর্দ্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে!

ঠাকুরদাদা

না ভাই আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর!

গান

আজ　ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
　　উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ　কিসের তরে　নদীর চরে
　　চখাচখির মেলা !

অন্য দল আসিয়া

ঠাকুর্দ্দা, এই বুঝি ! আমাদের তুমি ডেকে আন্‌লে না কেন ! তোমার সঙ্গে আড়ি ! জন্মের মত আড়ি !

ঠাকুরদাদা

এত বড় দণ্ড ! নিজেরা দোষ করে' আমাকে শাস্তি ! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আন্‌বি ! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর !

গান

ওরে　যাব না, আজ ঘরে যে ভাই
　　যাব না আজ ঘরে !
ওরে　আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
　　নেব রে লুঠ করে !
যেন　জোয়ার জলে ফেনার রাশি
　　বাতাসে আজ ছুট্‌চে হাসি,
আজ　বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
　　কাট্‌বে সকল বেলা।

প্রথম বালক

ঠাকুর্দ্দা, ঐ দেখ, ঐ দেখ সন্ন্যাসী আস্‌চে !

দ্বিতীয় বালক

বেশ হয়েচে বেশ হয়েচে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেল্‌ব! আমরা সব চেলা সাজ্‌ব।

তৃতীয় বালক

আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না!

ঠাকুরদাদা

আরে চুপ্, চুপ্!

সকলে

সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর!

ঠাকুরদাদা

আরে থাম্ থাম্! ঠাকুর রাগ করবে।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

বালকগণ

সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী

হা হা হা হা! এ ত খুব ভাল কথা! তারপরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজ্‌ব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা!

ঠাকুরদাদা

প্রণাম হই, আপনি কে?

সন্ন্যাসী

আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা

আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী

হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা

ও ঠাকুর বুঝেছি, বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন!

সন্ন্যাসী

চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে' খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েচে—সেইগুলো খসিয়ে ফেল্‌তে চাই।

ঠাকুরদাদা

বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধূলো দেবেন! প্রভু আপনার নাম বোধ করি শুনেছি—আপনি ত স্বামী অপূর্ব্বানন্দ?

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদাদা কি মিথ্যে বক্‌চেন! এমনি করে' আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেচ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আস্‌চে।

ছেলেরা

তোমার কতদিনের ছুটি ?

সন্ন্যাসী

খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে' বেরিয়েচেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে !

ছেলেরা

ও বাবা, তোমারো গুরুমশায় !

প্রথম বালক

সন্ন্যাসী ঠাকুর, চল আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চল। তোমার যেখানে খুসী !

ঠাকুরদাদা

আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর, আমাকেও ভুলোনা !

সন্ন্যাসী

আহা, ও ছেলেটি কে ? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েচে !

বালকগণ

উপনন্দ !

প্রথম বালক

ভাই উপনন্দ, এস ভাই ! আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে ! তুমি হবে সর্দ্দার চেলা।

উপনন্দ

না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা

কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এস!

উপনন্দ

আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা

সে বুঝি কাজ! ভারি ত কাজ! ঠাকুর, তুমি ওকে বল না! ও আমাদের কথা শুন্‌বে না! কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী

(পাশে বসিয়া)

বাছা, তুমি কি কাজ করচ? আজ ত কাজের দিন না!

উপনন্দ

(সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া)

আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে তাই আজ কাজ করচি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ

ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি

লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী ; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা

হায় হায় তোমার মত কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ! ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পূজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরি মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী

বল কি, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই ত আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেচেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মত এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেচে, চেয়ে দেখ ত! লেখ, লেখ, বাবা, তুমি লেখ, আমি দেখি! তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌চ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্চ,— তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা ত পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি! এমন দিনটা সার্থক হোক্!

ঠাকুরদাদা

আছে আছে চষমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই না!

প্রথম বালক

ঠাকুর, আমরাও লিখ্‌ব! সে বেশ মজা হবে!

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ সে বেশ মজা হবে!

উপনন্দ

বল কি, ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে!

সন্ন্যাসী

সেই জন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কি বল, বাবাসকল? আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্চে না।

সকলে

(হাততালি দিয়া)

হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের!

প্রথম বালক

দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও!

দ্বিতীয় বালক

আমাকেও একটা দাও না!

উপনন্দ

তোমরা পারবে ত ভাই?

প্রথম বালক

খুব পারব! কেন পারব না!

উপনন্দ

শ্রান্ত হবে না ত?

দ্বিতীয় বালক

কখ্‌খনো না।

উপনন্দ

খুব ধরে ধরে লিখ্‌তে হবে কিন্তু!

প্রথম বালক

তা বুঝি পারিনে! আচ্ছা তুমি দেখ!

উপনন্দ

ভুল থাক্‌লে চল্‌বে না।

দ্বিতীয় বালক

কিচ্ছু ভুল থাক্‌বে না।

প্রথম বালক

এ বেশ মজা হচ্চে! পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব!

দ্বিতীয় বালক

নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক

কি বল ঠাকুর্দ্দা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ঠাকুরদাদার গান

সিন্ধু ভৈরবী—তেওরা

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্!
বোঝা যত বোঝাই করি
করবরে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের পরে ধরব পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হতে কে করে রে মানা!
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা!
কোন্ শাপে কোন গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাক্‌ব বসে?
পালের রসি ধরব কসি
চলব গেয়ে গান।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা!

ঠাকুরদাদা

(জিভ কাটিয়া)

প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে?

সন্ন্যাসী

তুমি যে জগতে ঠাকুর্দ্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেচ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেচেন, সে ত তুমি লুকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না! ছোট ছোট ছেলে-গুলির কাছেও ধরা পড়েচ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে?

ঠাকুরদাদা

ছেলে ভোলানোই যে আমার কাজ—তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তাহলে কথা নেই। তা কি আজ্ঞা কর!

সন্ন্যাসী

আমি বল্‌ছিলেম ঐ যে গানটা গাইলে ওটা আজ ঠিক্ হল না। দুঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা ওটা আমার কানে ঠিক লাগচে না। দুঃখ ত জগৎ চেয়েই আছে কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখ না টানাটানির ত কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরত-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর একটা গান গাইতে হল।

ঠাকুরদাদা

তোমাদের সঙ্গ এই জন্যই এত দামী—ভুল করলেও ভুলকে সার্থক করে তোল।

সন্ন্যাসী

গান

ললিত—আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।

চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার!
ধন ধান্য তোমারি ধন,
কি করবে তা কও।
দিতে চাও ত দিয়ো আমায়
নিতে চাও ত লও!
দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ,
খাঁটি রতন তুই ত চিনিস্
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস্
এ মোর অহঙ্কার।

বাবা উপনন্দ তোমার প্রভুর কি নাম ছিল?

উপনন্দ

সুরসেন।

সন্ন্যাসী

সুরসেন? বীণাচার্য্য?

উপনন্দ

হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জান্‌তে?

সন্ন্যাসী

আমি তাঁর বীণা শুন্‌ব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ

তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল ?

ঠাকুরদাদা

তিনি কি এত বড় গুণী ? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেচ ? তবে ত আমরা তাঁকে চিনি নি ?

সন্ন্যাসী

এখানকার রাজা ?

ঠাকুরদাদা

এখানকার রাজা ত কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুন্‌লে ?

সন্ন্যাসী

তোমরা হয় ত জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা

বল কি ঠাকুর ! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্ত্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী

তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, এত বড় লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী

আদর করনি—তাতে তাঁকে কমাতে পারনি, আরো তাঁকে বড় করেচ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েচেন। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কি রকম সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ

ছোট বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ কর্‌ছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনি মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বল্লেন, এস বাবা, আমার ঘরে এস। সেই দিন থেকে ছেলের মত তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেচেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেননি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহলে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বল্লেন, বাবা, এ

বিদ্যা পেট ভরাবার নয় ; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্চি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে' পুঁথি লিখ্‌তে শিখিয়েচেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠ্‌ত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌তেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জান্‌ত।

সন্ন্যাসী

স্থরসেনের বীণা শুন্‌তে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর স্থর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখ, লেখ !

ছেলেরা

ঐরে ঐ আস্‌চে ! ঐরে লখা, ঐরে লক্ষ্মীপেঁচা।

(দৌড়)

লক্ষেশ্বর

আ সর্ব্বনাশ ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে ! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে ! তা ত নয় দেখ্‌চি ! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা ! আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখ্‌চি ! সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে ! উপনন্দ !

উপনন্দ

কি।

লক্ষেশ্বর

ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে! এখানে কি করতে এসেছিস?

উপনন্দ

অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা না কি?

লক্ষেশ্বর

এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কিহে বাপু। ভারি সেয়না দেখ্‌চি! তুমি বড় ভালমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে! আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেচে—কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ

আমি ত সেই জন্যেই এখানে পুঁথি লিখ্‌তে এসেছি।

লক্ষেশ্বর

সেই জন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করচ বাপু! আমি কি শিশু!

সন্ন্যাসী

কেন বাবা, তুমি কি সন্দেহ করচ?

লক্ষেশ্বর

কি সন্দেহ করচি! তুমি তা কি কিছু জান না। বড় সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা

আরে কি বলিস্ লখা? আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ

এই রং-বাঁটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না! টাকা হয়েচে বলে অহঙ্কার! কাকে কি বলতে হয় জান না?

(সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন)

সন্ন্যাসী

আরে কর কি ঠাকুরদাদা, কর কি বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে! যেম্‌নি দেখেচে অম্‌নি ধরা পড়ে গেছি! ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না!

লক্ষেশ্বর

না, ঠিক ঠাওরাতে পাচ্চিনে! হয় ত ভাল করিনি! আবার শাপ দেবে, কি, কি করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধূলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর,—হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি! ঠাকুর্দ্দা, তুমি এক কাজ কর! সন্ন্যাসী

ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চল্লেম বলে। তোমরা এগোও!

ঠাকুরদাদা

তোমার বড় দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেচেন!

সন্ন্যাসী

বল কি ঠাকুর্দ্দা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈ কি! বাবা লক্ষেশ্বর চল তোমার ঘরে!

লক্ষেশ্বর

আমি পরে যাচ্চি, তোমরা এগোও! উপনন্দ, তুমি আগে ওঠ! ওঠ, শীঘ্র ওঠ বলচি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র!

উপনন্দ

আচ্ছা তবে উঠ্‌লেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না!

লক্ষেশ্বর

না থাক্‌লেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কি! এত দিন ত আমার বেশ চলে যাচ্ছিল!

উপনন্দ

আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস চুকে গেল!

(প্রস্থান)

লক্ষেশ্বর

ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে না কি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভাল! এখন কি করি! (সন্ন্যাসী ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বস—এই যে এইখানে—আর একটু বাঁ দিকে সরে এস—এই হয়েচে! খুব চেপে বস! রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না! তাহলে আমি তোমাকে খুসি করে দেব!

ঠাকুরদাদা

আরে লখা করে কি! হঠাৎ খেপে গেল না কি!

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই! আমাকে দেখ্‌লেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েচে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেচি—শুনে অবধি রাজা কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেচেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রজাদের জলদান করচেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিৎ কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমতে পারিনে!

(প্রস্থান)

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত

সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম হই ! আপনিই ত অপূর্ব্বানন্দ ?

সন্ন্যাসী

কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই ত জানে !

দূত

আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী

যখনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনি আমাকে দেখ্‌তে পাবেন।

দূত

আপনি তাহলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী

আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাক্‌ব। এতএব আমার মত অকিঞ্চন অকর্ম্মণ্যাকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহ'লে তাঁকে এইখানেই আস্‌তে হবে।

দূত

রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করচেন।

সন্ন্যাসী

যদি নিকটেই হয় তবে ত তাঁর আস্‌তে কোনো কষ্ট হবে না।

দূত

যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাইগে!

(প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল, আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখ, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা

রাজার উৎপাতই ঘটুক্ আর অরাজকতাই হোক্ আমি প্রভুর চরণ ছাড়চিনে।

(প্রস্থান)

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর তুমিই অপূর্ব্বানন্দ? তবে ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে! আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী

তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর

বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে ত সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কি হবে! আমাকে একটা কিছু ভাল রকম বর দিতে হচ্চে! যখন দেখা পেয়েচি তখন শুধুহাতে ফিরচিনে!

সন্ন্যাসী

কি বর চাই?

লক্ষেশ্বর

লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কি না আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেচে—সে অতি যৎসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ত মিট্‌চে না। শরৎকাল এসেচে, আর ঘরে বসে থাক্‌তে পারচিনে—এখন বাণিজ্যে বেরতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়!

সন্ন্যাসী

আমিও ত সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর

বল কি ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

আমি সত্যই বলচি!

লক্ষেশ্বর

ওঃ তবে সেই কথাটাই বল! বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা!

সন্ন্যাসী

তার সন্দেহ আছে!

লক্ষেশ্বর

(কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে)

সন্ধান কিছু পেয়েচ?

সন্ন্যাসী

কিছু পেয়েচি বই কি! নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর

(সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া)

বাবাঠাকুর, আর একটু খোলসা করে বল! তোমার পা ছুঁয়ে বলচি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না! কি খুঁজচ বল ত, আমি কাউকে বলব না!

সন্ন্যাসী

তবে শোন! লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপর পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর

ও বাবা, সে ত কম কথা নয়! তাহলে যে একেবারে

সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ ত তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেচ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজ্‌তে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুণটিকে ত জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাক্‌বে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠ্‌বে? এতে ত খরচপত্র আছে। এক কাজ কর না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী

তাহলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর

সে যে শক্ত কথা!

সন্ন্যাসী

সব ব্যবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যবসা চল্‌বে!

লক্ষেশ্বর

শেষকালে দুকূল যাবে না ত? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তাহলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চল্‌তে রাজি আছি। সত্যি বলচি ঠাকুর, কারো কথায় বড় সহজে বিশ্বাস করিনে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগ্‌চে! আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব! ঐরে রাজা আস্‌চে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াইগে!

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া—ঝাঁপতাল

রাজ রাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারী,
সঙ্কট শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

রাজার প্রবেশ

রাজা

প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

জয় হোক্! কি বাসনা তোমার?

রাজা

সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী

তাহলে গোড়া থেকে সুরু কর। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও!

রাজা

পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাক্‌তে পারব না।

সন্ন্যাসী

রাজন্‌ তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা

বল কি ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

এক বর্ণও মিথ্যা বলচি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করচি।

রাজা

তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েচ?

সন্ন্যাসী

তাই বটে!

রাজা

মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে?

সন্ন্যাসী

অসম্ভব নেই।

রাজা

তাহলে ঠাকুর আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব! যদি সে বশ মানে তাহলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী

তা বেশ, সেই চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌কে আমি তোমার সভায় ধরে আন্‌ব।

রাজা

কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করচে না। শরৎকাল এসেচে—সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্ব্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী

কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এইত উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কি করবে?

রাজা

আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব—তার অহঙ্কার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী

এ ত খুব ভাল কথা! যদি তার অহঙ্কার চূর্ণ করতে পার তাহলে ভারি খুসি হব।

রাজা

ঠাকুর, চল আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী

সেটি পারচিনে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিচ্ছু ভেব না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেচ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্চে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেচে তা ত আমি জান্‌তেম না।

রাজা

তবে বিদায় হই। প্রণাম।

(প্রস্থান)

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া)

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি ত বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বল দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য ?

সন্ন্যাসী

কিছুমাত্র না! লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মত। তার সাজ সজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা

বল কি ঠাকুর, হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরে-ছিলেম। অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ ?

সন্ন্যাসী

আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে

বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোষাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা

তাই দিয়ো, ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী

তার ভণ্ডামি আমার কাছে ত কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সে দিন সব চাষী গৃহস্থরা বনে গিয়ে সীতার পূজা করে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে এক সঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে! রাজাই হোক্ আর যাই হোক্ ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে ত সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে যাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকরবাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বল্লে এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেল্লেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। এই জন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড় ভয়ে ভয়েই থাকে—কোন্ দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা!

রাজা

ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও! ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড় অহঙ্কার হয়েছে!

সন্ন্যাসী

আমি ত সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা

প্রণাম।

(প্রস্থান)

(উপনন্দের প্রবেশ)

উপনন্দ

ঠাকুর, আমার মনের ভার ত গেল না!

সন্ন্যাসী

কি হল বাবা!

উপনন্দ

মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেচে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধূলো ঝাড়তে গিয়ে তার-গুলি বেজে উঠ্‌ল—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন

হল সে আমি বল্‌তে পারিনে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ ত আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্চে না! ইচ্ছা করচে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি! আমি তোমাকে মিথ্যা বলচিনে তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে,—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী

বাবা, তুমি যা বলচ সত্যই বল্‌চ।

উপনন্দ

ঠাকুর, তুমি ত অনেক দেশ ঘুরেচ আমার মত অকর্ম্মণ্যকেও হাজার কার্ষ পণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তাহলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তাহলে বালক বলে ছোট জাত বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী

না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবচি কি যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ

বিজয়াদিত্য ? তিনি যে আমাদের সম্রাট !

সন্ন্যাসী

তাই না কি ?

উপনন্দ

তুমি জাননা বুঝি ?

সন্ন্যাসী

তা হবে। না হয় তাই হল !

উপনন্দ

আমার মত ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিন্‌বেন ?

সন্ন্যাসী

বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মত ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তাহলে বিনামূল্যেই কিন্‌বেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জম্‌বে যে তাঁর রাজ-ভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বল্‌চি।

উপনন্দ

ঠাকুর, এও কি সম্ভব ?

সন্ন্যাসী

বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড় সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই ?

উপনন্দ

আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় ত হবে, কিন্তু আমি ততদিন

পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড় গ্লানি হচ্চে।

সন্ন্যাসী

ঠিক কথা বলেচ বাবা! বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারো প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়োনা।

উপনন্দ

তাহলে চল্লেম ঠাকুর! তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েচি সে আমি বলে উঠতে পারিনে।

সন্ন্যাসী

তোমাকে দেখে আমিও যে কত বল লাভ করেচি সে কথা কেমন করে বুঝবে? এক কাজ কর বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙ্গে গিয়েচে আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসগে!

উপনন্দ

তা আন্‌চি, কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চল্‌বে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুসি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারিনে।

(প্রস্থান)

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম—পারব না! তোমার

চেলা হওয়া আমার কর্ম্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই!

সন্ন্যাসী

সে কথাটা বুঝ্‌লেই হল।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্চে!

সন্ন্যাসী

(উঠিয়া)

তাহলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল!

লক্ষেশ্বর

(মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া)

ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চারদিকে ভূতের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্য্যন্ত কেবলি এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হাল্কা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না হলনা! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিষ একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেচি আমার বুকের ভিতরে যেন গুর্‌গুর্ করচে!

আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বল ত? তাকে বিক্রি করতে গেলে সে ত দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুস্কিল হয়েচে! আমি এটা বেচ্‌তেও পারচিনে, রাখতেও পারচিনে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী

সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর

সেই ত মুস্কিলের কথা! আমি দেখ্‌চি এটা মাটিতেই পোঁতা থাক্‌বে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী

রাজাও না সম্রাট্‌ও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে! তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে!

লক্ষেশ্বর

তা নিক্‌গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয় ত খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক্ ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড় ভাল লাগ্‌ল। আমার কেমন মনে হচ্চে ওটা তুমি হয় ত খুঁজে বের করতে

পারবে। কিন্তু তা হোক্‌গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না! প্রণাম!

(প্রস্থান)

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেচি—সেটি তোমাকে খুলে না বলে থাকৃতে পারচিনে।

ঠাকুরদাদা

আমার প্রতি ঠাকুরের বড় দয়া!

সন্ন্যাসী

আমি অনেকদিন ভেবেচি জগৎ এমন আশ্চর্য্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করচে! বড় সহজে করচে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করচে! সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্য্যে ভরে উঠেচে, বেতসিনীর নির্ম্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য্য!

ঠাকুরদাদা

একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলি ঢেলে দিচ্চেন আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারি শোধ চল্‌চে। সেই

দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য যে কি সে কথা তোমার কাছে পূর্ব্বেই শুনেচি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্চে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেচে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণ শোধে ঢিল্ পড়ে' যাচ্চে সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থ।

ঠাকুরদাদা

সেইখানেই যে একপক্ষে কম পড়ে' যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পূরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী

লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেচে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েচি!

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

তোমরা চুপি চুপি দুটিতে কি পরামর্শ করচ?

সন্ন্যাসী

আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর

অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুর্দ্দার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানী করবে? তবেই হয়েচে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অম্‌নি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এসব কি ঠাকুর্দ্দার কর্ম্ম? ওঁর পুঁজিই বা কি?

সন্ন্যাসী

তুমি খবর পাওনি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়! ভিতরে ভিতরে জমিয়েচে।

লক্ষেশ্বর

(ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া)

সত্যি না কি ঠাকুর্দ্দা? বড় ত ফাঁকি দিয়ে আস্‌চ! তোমাকে ত চিনতেম না! লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে ত স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না! তাহলে এতদিনে খানাতল্লাসী পড়ে যেত। আমি ত, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখিনে।

ঠাকুরদাদা

তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় ঊর্দ্ধস্বরে চোবে, তেওয়ারা, গির্‌ধারালালকে হাঁক পাড়ছিলে!

লক্ষেশ্বর

যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আস্‌বে না,

তখন উৰ্দ্ধস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুল্‌তে হয়! কিন্তু বলে ত ভাল করলেম না! মানুষের সঙ্গে কথা কবার ত বিপদই ঐ! সেই জন্যেই কারো কাছে ঘেঁসি নে! দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়োনা!

ঠাকুরদাদা

ভয় নেই তোমার!

লক্ষেশ্বর

ভয় না থাক্‌লেও তবু ভয় ঘোচে কই! যা হোক্‌ ঠাকুর, একা ঠাকুৰ্দ্দাকে নিয়ে অত বড় কাজটা চল্‌বে না! আমরা না হয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুৰ্দ্দা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্চে না! আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম! ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আস্‌চে! ঐ দেখ্‌চ না দূরে—আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েচে! সবাই খবর পেয়েচে স্বামী অপূৰ্ব্বা নন্দ এসেচেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পৰ্য্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক্‌ তুমি যে রকম আলগা মানুষ দেখ‌চি, সেই কথাটা আর কারো কাছে ফাঁস কোরোনা—অংশীদার আর বাড়িয়োনা! কিন্তু ঠাকুৰ্দ্দা, লাভলোকসানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হলেই হয় না; সব কথা ভেবে দেখো!

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, আর ত দেরি করলে চল্‌বে না। লোকজন জুট্‌তে আরম্ভ করেচে, পুত্র দাও ধন দাও করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে! ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাক। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা

ছেলেদের আর ডাক্‌তে হবেনা। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্চে! এল বলে!

(লক্ষেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

না বাবা, আমি পাবব না! ভাল বুঝ্‌তে পারচিনে। ও সব আমার কাজ নেই—আমার যা আছে সেই ভাল। কিন্তু তুমি আমাকে কি যেন মন্ত্র করেচ তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার ত রক্ষে নেই! তুমি ঠাকুর্দ্দাকে নিয়েই কারবার কর, আমি চল্লেম।

(দ্রুত প্রস্থান)

(ছেলেদের প্রবেশ)

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

কি বাবা!

ছেলেরা

তুমি আমাদের নিয়ে খেল !

সন্ন্যাসী

সে কি হয় বাবা ! আমার কি সে ক্ষমতা আছে ? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও !

ছেলেরা

কি খেলা খেলবে ?

সন্ন্যাসী

আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক

সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক

সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক

সে কি খেলা ঠাকুর ?

চতুর্থ বালক

সে কেমন করে খেল্‌তে হয় ?

সন্ন্যাসী

তবে এক কাজ কর। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এস। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আন্‌তে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলি ফুলের মালা গেঁথে ঐ খানে ফেলে রেখে গেছ সেগুলো নিয়ে এস।

প্রথম বালক

কি কর্ত্তে হবে ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী

আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে—আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত।

সকলে

(হাততালি দিয়া)

হাঁ, হাঁ, হাঁ ! সে বড় মজাই হবে।

(কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল)

(একদল লোকের প্রবেশ)

প্রথম ব্যক্তি

ওরে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে !

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

বালকগণ

এই যে আমাদের সন্ন্যাসী !

প্রথম

ও ত তোদের খেলার সন্ন্যাসী ! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন !

সন্ন্যাসী

সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে? আমি এই ছেলেদের সঙ্গে মিলে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলচি।

প্রথম ব্যক্তি

ও তোমার কি রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি

ফেল ফেল তোমার জটা ফেল!

চতুর্থ ব্যক্তি

দেখ না আবার গেরুয়া পরেচে!

সন্ন্যাসী

জটাও ফেল্‌ব, গেরুয়াও ছাড়ব, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক্!

প্রথম ব্যক্তি

তবে যে আমাদের কে একজন বল্লে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেচে!

সন্ন্যাসী

যদি বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কেন? সে ভণ্ড না কি?

সন্ন্যাসী

তা নয় ত কি ?

তৃতীয় ব্যক্তি

বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভাল। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ ?

সন্ন্যাসী

শেখবার ইচ্ছা ত আছে কিন্তু শেখায় কে ?

তৃতীয় ব্যক্তি

একটি লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কি, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বল্লে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্য বেঁচে আছে। না, হাস্‌চ কি, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেচে! সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল! বিদ্যে যদি শিখ্‌তে চাও ত সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও!

প্রথম ব্যক্তি

ওরে চল্‌ রে বেলা হয়ে গেল! সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে! সে কথা আমি ত তখনি বলেছিলেম। আজকাল-কার দিনে কি আর সে রকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

সে ত সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বল্লে তার ভাগ্‌নে নিজের চক্ষে দেখে এসেচে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কল্কেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ব্যক্তি

বল কি, নিজের চক্ষে দেখেচে ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি

হাঁরে, নিজের চক্ষে বৈ কি !

তৃতীয় ব্যক্তি

আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে ; ভাগ্যে যদি থাকে তবে ত দর্শন পাব ! তা চল্‌না ভাই, কোন্‌দিকে গেল একবার দেখে আসিগে !

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

(বালকদের প্রতি)

বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে !

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী

বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েচে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে ত—নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কি করে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিল্‌ব বলেই ত উৎসব।

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর?

সন্ন্যাসী

ঐ বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও। যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে! ঠাকুর্দ্দা তুমি এদের সাজিয়ে আনগে!

ঠাকুরদাদা

তবে চল সবাই।

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসীর গান

রামকেলি—কাওয়ালী

নব কুন্দধবলদল-সুশীতলা
অতি সুনির্ম্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ আসনে অচঞ্চলা।
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা।

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

দেখ ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও ত ভাল হবে না বলচি। কি মুস্কিলেই ফেলেচ, আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্‌গে ও সব বাজে কথা! একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুর্দ্দাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক্‌গে ঠাকুর্দ্দা! ঠাকুর, এ ত ভাল কথা নয়! চেলা-ধরা ব্যবসা দেখচি তোমার! কিন্তু সে হবে না, কোনো মতেই হবে না! চুপ করে হাস্‌চ কি! আমি বল্‌চি আমাকে পারবে না—আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনো-দিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না!

(প্রস্থান)

(ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী

এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক্‌! এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেচ দেখচি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও! একবার পূর্ব্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্‌যত্রোপদৃশ্যতে॥

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এস। ঠাকুর্দ্দা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও! তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি—একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসগো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে!
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা॥

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে!
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা॥

সন্ন্যাসী

পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে! দ্বার খুলেচে তাঁর! দেখ্‌তে পাচ্চ কি, শারদা বেরিয়েচেন! দেখ্‌তে পাচ্চনা? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে! সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে; যেখানে প্রতিদিন ঊষার প্রথম

পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাক, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখ্‌তে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি!

গান

ভৈরবী—একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া॥

এবারে আর দেখ্‌তে পাইনি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক

কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও না।

সন্ন্যাসী

ঐ যে শাদা মেঘ ভেসে আস্‌চে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ ভেসে আস্‌চে!

তৃতীয় বালক

হাঁ আমিও দেখেচি!

সন্ন্যাসী

ঐ যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক

কিসে?

সন্ন্যাসী

কিসে! এই ত স্পষ্টই দেখা যাচ্চে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্চনা?

দ্বিতীয় বালক

হাঁ পাচ্চি।

সন্ন্যাসী

তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হয়েচে, শরীর পবিত্র হয়েচে, মন প্রশান্ত হয়েচে। এসেচেন, এসেচেন, আমাদের মাঝখানেই এসেচেন। দেখ্‌চনা বেতসিনী নদীর ভাবটা!

আর ধানের ক্ষেত কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেচে! গাও গাও, ঠাকুর্দ্দা, বরণের গানটা গাও!

ঠাকুরদাদার গান

আলেয়া—একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!

আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী

যাও, বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসগে।

(ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি! ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেচি! এখান থেকে আর নড়তে পারব না!

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা

এ কি হল! লখা গেরুয়া ধরেচ যে!

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো—এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো!

সন্ন্যাসী

তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর

সহজে হয়নি প্রভু ! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আস্‌চে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাক্‌বে ? তোমার গায়ে ত কেউ হাত দিতে পারবে না, এ সমস্ত তোমার কাছেই রাখ্‌লেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কর বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা

সন্ন্যাসী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী

বোস, বোস, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েচ ! একটু বিশ্রাম কর !

রাজা

বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েচে —তাঁর সৈন্যদল আস্‌চে !

সন্ন্যাসী

বল কি ! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিঁকতে দেয়নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েচেন।

রাজা

কি সর্ব্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েচেন!

সন্ন্যাসী

বাবা, এতে দুঃখিত হলে চল্‌বে কেন? তুমিও ত রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরবার উদ্যোগে ছিলে!

রাজা

না, সে হল স্বতন্ত্র কথা! তাই বলে আমার এই রাজ্য-টুকুতে—তা সে যাই হোক্‌, আমি তোমার শরণাগত! এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোন দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েচে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেচি; তুমি তাঁকে বলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যা! আমি কি এম্‌নি উন্মত্ত? আমার রাজচক্রবর্ত্তী হবার দরকার কি? আমার শক্তিই বা এমন কি আছে?

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা!

ঠাকুরদাদা

কি প্রভু?

সন্ন্যাসী

দেখ, আমি কৌপীন পরে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলুম আর ঐ চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌টা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব

কেবল নষ্টই করতে পারে! লোকটা কি রকম দুর্ভাগা দেখেচ!

রাজা

চুপ কর, চুপ কর ঠাকুর! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে!

সন্ন্যাসী

ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

রাজা

আরে চুপ, চুপ! তুমি সর্ব্বনাশ করবে দেখ্‌চি! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক সে তুমি মনেই রেখে দাও!

সন্ন্যাসী

তোমার সঙ্গে পূর্ব্বেও ত সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে!

রাজা

কি মুস্কিলেই পড়লেম! সে সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্ না! ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কি শুনচ! এখান থেকে যাও না!

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কি আছে! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেচে! যমে না নড়ালে আমার আর

নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সাম্‌নে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

(বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী

জয় হোক্ মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী বিজয়াদিত্য!

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

রাজা

আরে করেন কি, করেন কি! আমাকে পরিহাস করচেন নাকি! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী

মহারাজ, সময় ত অতীত হয়েচে এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, পূর্ব্বেই ত বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েচি কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেচেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু এ কি কাণ্ড! আমি ত স্বপ্ন দেখচিনে!

সন্ন্যাসী

স্বপ্ন তুমিই দেখ্‌চ কি এঁরাই দেখ্‌চেন তা নিশ্চয় করে কে বল্‌বে?

ঠাকুরদাদা

তবে কি—

সন্ন্যাসী

হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই ত জানেন!

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমিই ত তবে জিতেছি! এই কয়দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েচি তা এঁরা পর্য্যন্ত পাননি! কিন্তু বড় সঙ্কটে ফেল্লে ত ঠাকুর!

লক্ষেশ্বর

আমিও বড় সঙ্কটে পড়েছি মহারাজ! আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েচি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্চিনে!

রাজা

মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী

না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা

(জোড়হস্তে) এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কি বিধান?

সন্ন্যাসী

বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা

আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত!

সন্ন্যাসী

তার মধ্যে একটা ত উদ্ধার করেচি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ সেটা ত ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা কিছু কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির করে দেব—তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বল!

রাজা

(নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী

তা বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট বলে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছু অপরাধ সে রাজকার্য্যেরই ত্রুটি। সে রকম যদি কিছু ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন

তোমার রাজ্যে থেকে সে সমস্তই স্বহস্তে মার্জ্জনা করে দিয়ে যাব।

রাজা

মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েচেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেচি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘট্‌তে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কি করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই!

সন্ন্যাসী

উপদেশটি কথায় ছোট, কাজে অত্যন্ত বড়। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা

উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠ্‌ব বলে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর

আমাকেও ঠাকুর,—না, না, মহারাজ ঐ রকম একটা কি উপদেশ দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠ্‌লেম না, বোধ করি মনে রাখ্‌তেও পারব না।

সন্ন্যাসী

উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই!

লক্ষেশ্বর

আজ্ঞা না!

(উপনন্দের প্রবেশ)

উপনন্দ

ঠাকুর! এ কি, রাজা যে! এরা সব কারা!

(পলায়নোদ্যম)

সন্ন্যাসী

এস, এস, বাবা, এস! কি বল্‌ছিলে বল! (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সাম্‌নে বল্‌তে লজ্জা করচ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও! তোমরাও—

উপনন্দ

সে কি কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বল্‌তে এসেছিলেম এই ক'দিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখ!

সন্ন্যাসী

আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাব্‌চ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেচি এ আমার তারি দক্ষিণা। কি বল বাবা!

উপনন্দ

ঠাকুর তুমি নেবে?

সন্ন্যাসী

নেব বই কি! তুমি ভাব্‌চ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই

আমার কিছুতে লোভ নেই ? এ সব জিনিষে আমার ভারি লোভ !

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ ! তবেই হয়েছে ! ডাইনের হাঁতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখ্‌চি !

সন্ন্যাসী

ওগো শ্রেষ্ঠী !

শ্রেষ্ঠী

আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী

এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও !

শ্রেষ্ঠী

যে আদেশ !

উপনন্দ

তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন ?

সন্ন্যাসী

উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কি ! তুমি আমার !

উপনন্দ

(পা জড়াইয়া ধরিয়া)

আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল !

সন্ন্যাসী

ওগো সুভূতি!

মন্ত্রী

আজ্ঞা!

সন্ন্যাসী

আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্ম্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেচি।

লক্ষেশ্বর

হায় হায় আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে কি সুযোগটাই পেরিয়ে গেল!

মন্ত্রী

বড় আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী

ইনি যে গৃহে জন্মেচেন সে গৃহে জগতের অনেক বড় বড় বীর জন্মগ্রহণ করেচেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর

কি আদেশ!

সন্ন্যাসী

বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তাহলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে !

সন্ন্যাসী

এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন তোমার ভয় নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ করলে !

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর

এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী

আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে ?

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী

তবে তোমার ভয় নেই, যাও !

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী

এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর

তবে প্রণাম হই! চারদিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্চে!

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা

সে কি কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন,—

সন্ন্যাসী

তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা

যাকে ইচ্ছা নাম করুন সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্চি! না হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী

বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই!

রাজা

কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী

না, অত বড় লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না আমি একেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা

বয়সে মিল্‌বে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুল্‌তে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায় তাইত দেখ্‌চি! আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েচে না কি!

ঠাকুরদাদা

কারো পালাবার পথ কি রেখেচ? আটঘাট ঘিরে ফেলেচ যে। ঐ আস্‌চে!

(বালকগণের প্রবেশ)

সকলে

সন্ন্যাসীঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

এস, বাবা, সব এস !

সকলে

এ কি ! এ যে রাজা ! আরে পালা, পালা !
(পলায়নোদ্যম)

ঠাকুরদাদা

আরে পালাস্‌নে !

সন্ন্যাসী

তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্চেন। যাও সোমপাল সভা প্রস্তুত করগে, আমি যাচ্চি।

রাজা

যে আদেশ।

(প্রস্থান)

বালকেরা

আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি এইবার এখানে গান শেষ করি !

ঠাকুরদাদা

হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আলেয়া—একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !

শারদোৎসব

শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন ভুলানো এলে।
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কি কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু'হাত দিয়ে ফেল ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে!
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে।

৭ই ভাদ্র ১৩১৫।

ডাকঘর

ডাকঘর

১

মাধব দত্ত

মুস্কিলে পড়ে' গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না—কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বস্‌ল ; ও চলে' গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাক্‌বে না। কবিরাজ মশায় আপনি কি মনে করেন ওকে—

কবিরাজ

ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে তাহ'লে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে যে রকম লিখ্‌চে তাতে ত—

মাধব দত্ত

বলেন কি ?

কবিরাজ

শাস্ত্রে বল্‌চেন

পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমুদ্ভবান—

মাধব দত্ত

থাক্ থাক্ আপনি আর ঐ শ্লোকগুলো আওড়াবেন

না—ওতে আরও আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কি করতে হবে সেইটে বলে' দিন।

কবিরাজ

(নস্য লইয়া)

খুব সাবধানে রাখ্‌তে হবে।

মাধব দত্ত

সে ত ঠিক কথা কিন্তু কি বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে সেইটে স্থির করে' দিয়ে যান।

কবিরাজ

আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধব দত্ত

ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে' রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ

তা কি করবেন বলেন! এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুইই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ—কারণ কিনা শাস্ত্রে বল্‌চে—

অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে—

মাধব দত্ত

থাক্ থাক্ আপনার শাস্ত্র থাক্। তাহ'লে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে—অন্য কোনো উপায় নেই?

কবিরাজ

কিছু না, কারণ,—পবনে তপনে চৈব—

মাধব দত্ত

আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কি হবে বলেন ত! ও থাক্ না—কি করতে হবে সেইটে বলে' দিন! কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড় কঠোর! রোগের সমস্ত দুঃখ ও বেচারা চুপ করে' সহ্য করে—কিন্তু আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ

সেই কষ্ট যত প্রবল তা'র ফলও তত বেশী—তাই ত মহর্ষি চ্যবন বলেছেন—

ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তং আশু ফলপ্রদং।

আজ তবে উঠি দত্ত মশায়!

(প্রস্থান)

(ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

মাধব দত্ত

ঐরে ঠাকুর্দ্দা এসেছে! সর্ব্বনাশ করলে!

ঠাকুর্দ্দা

কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব দত্ত

তুমি যে ছেলে ক্ষ্যাপাবার সর্দ্দার।

ঠাকুর্দ্দা

তুমি ত ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই,—তোমার ক্ষ্যাপবার বয়সও গেছে—তোমার ভাবনা কি ?

মাধব দত্ত

ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুর্দ্দা

সে কি রকম ?

মাধব দত্ত

আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল।

ঠাকুর্দ্দা

সে ত অনেকদিন থেকে শুনচি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না !

মাধব দত্ত

জান ত ভাই অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথাথেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাক্‌বে সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কি রকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুর্দ্দা

তাই, এর জন্যে টাকা যতই খরচ করচ ততই মনে করচ সে যেন টাকার পরম ভাগ্য !

মাধব দত্ত

আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মত ছিল—না করে' কোনোমতে থাক্‌তে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করচি সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে, উপার্জ্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্চি।

ঠাকুর্দ্দা

বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বল দেখি!

মাধব দত্ত

আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তা'র বাপও মারা গেছে।

ঠাকুর্দ্দা

আহা! তবে ত আমাকে তা'র দরকার আছে।

মাধব দত্ত

কবিরাজ বলচে তা'র ঐটুকু শরীরে এক সঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যে রকম প্রকুপিত হ'য়ে উঠেছে তা'তে তা'র আর বড় আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তা'কে কোনো রকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়ো বয়সের খেলা—তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুর্দ্দা

মিছে বলনি—একেবারে ভয়ানক হ'য়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মত। কিন্তু ভাই ঘরে ধরে'

রাখবার মত খেলাও আমি কিছু জানি। আমার কাজকর্ম্ম একটু সেরে আসি তা'র পরে ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে' নেব।

(প্রস্থান)

(অমলগুপ্তের প্রবেশ)

অমল

পিসে মশায়!

মাধব দত্ত

কি অমল!

অমল

আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব দত্ত

না, বাবা!

অমল

ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন? ঐ দেখ না যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে' কাঠ-বিড়ালী কুটুস্ কুটুস্ করে' খাচ্চে ওখানে আমি যেতে পারব না?

মাধব দত্ত

না, বাবা!

অমল

আমি যদি কাঠবিড়ালী হতুম তবে বেশ হ'ত! কিন্তু পিসে মশায়, আমাকে কেন বেরতে দেবে না?

মাধব দত্ত

কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল

কবিরাজ কেমন করে’ জানলে ?

মাধব দত্ত

বল কি অমল ? কবিরাজ জানবে না ? সে যে এত বড় বড় পুঁথি পড়ে’ ফেলেছে।

অমল

পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জান্‌তে পারে ?

মাধব দত্ত

বেশ ! তাও বুঝি জান না ?

অমল

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়িনি— তাই জানি নে।

মাধব দত্ত

দেখ, বড় বড় পণ্ডিতরা সব তোমারই মত—তারা ঘর থেকে ত বেরয় না।

অমল

বেরয় না ?

মাধব দত্ত

না, কখন বেরবে বল ? তা’রা বসে’ বসে’ কেবল পুঁথি পড়ে—আর কোনোদিকেই তাদের চোখ নেই।

অমলবাবু, তুমিও বড় হ'লে পণ্ডিত হবে—বসে' বসে' এই এত বড় বড় সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে!

অমল

না, না, পিসে মশায় তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না, পিসে মশায় আমি পণ্ডিত হব না!

মাধব দত্ত

সে কি কথা অমল? যদি পণ্ডিত হ'তে পারতুম তাহ'লে আমি ত বেঁচে যেতুম!

অমল

আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলি দেখে বেড়াব।

মাধব দত্ত

শোনো একবার! দেখবে কি? দেখবার এত আছেই বা কি?

অমল

আমাদের জান্‌লার কাছে বসে' সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হ'য়ে চলে' যাই।

মাধব দত্ত

কি পাগলের মত কথা! কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হ'য়ে চলে' যাই! কি যে বলে তা'র ঠিক নেই! পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মত উঁচু হ'য়ে আছে তখন ত

বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ—নইলে এত বড় বড় পাথর জড় করে' এত বড় একটা কাণ্ড করার দরকার কি ছিল !

অমল

পিসে মশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করচে ? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে' নীল আকাশে হাত তুলে ডাকচে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে' থাকে তা'রাও দুপুর বেলা একলা জান্‌লার ধারে বসে' ঐ ডাক শুন্‌তে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুন্‌তে পায় না !

মাধব দত্ত

তা'রা ত তোমার মত ক্ষ্যাপা নয়—তা'রা শুনতে চায়ও না।

অমল

আমার মত ক্ষ্যাপা আমি কাল্‌কে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধব দত্ত

সত্যি নাকি ! কি রকম শুনি।

অমল

তা'র কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তা'র বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরা জুতো পরে' সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ

পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তা'কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্চ ? সে বল্লে, কি জানি, যেখানে হয়!—আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন যাচ্চ ? সে বল্লে, কাজ খুঁজতে যাচ্চি। আচ্ছা, পিসে মশায় কাজ কি খুঁজতে হয় ?

মাধব দত্ত

হয় বই কি! কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়!

অমল

বেশ ত! আমিও তাদের মত কাজ খুঁজে বেড়াব!

মাধব দত্ত

খুঁজে যদি না পাও ?

অমল

খুঁজে যদি না পাই ত আবার খুঁজব।—তা'র পরে সেই নাগরা জুতোপরা লোকটা চলে' গেল—আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝরণা ব'য়ে যাচ্চে সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরণার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে—তা'র পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে' জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হ'য়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে' নিলে—পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরণার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হ'য়ে চলে' গেল। পিসিমাকে বলে' রেখেছি ঐ ঝরণার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব দত্ত

পিসিমা কি বল্লে ?

অমল

পিসিমা বল্লেন, তুমি ভালো হও তা'র পর তোমাকে ঐ ঝরণার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভালো হব ?

মাধব দত্ত

আর ত দেরি নেই বাবা।

অমল

দেরি নেই ? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে' যাব।

মাধব দত্ত

কোথায় যাবে ?

অমল

কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হ'তে হ'তে চলে' যাব—দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে' শুয়ে আছে তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে' যাব।

মাধব দত্ত

আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও তা'র পরে তুমি—

অমল

তা'র পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসে মশায় !

মাধব দত্ত

তুমি কি হ'তে চাও বল।

অমল

এখন আমার কিছু মনে পড়্‌ছে না—আচ্ছা আমি ভেবে বল্‌ব।

মাধব দত্ত

কিন্তু তুমি অমন করে' যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না।

অমল

বিদেশী লোক আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত

যদি তোমাকে ধরে' নিয়ে যেত ?

অমল

তাহ'লে ত সে বেশ হ'ত! কিন্তু আমাকে ত কেউ ধরে' নিয়ে যায় না—সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত

আমার কাজ আছে আমি চল্লুম—কিন্তু বাবা দেখো বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল

যাব না। কিন্তু পিসে মশায় রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে' থাকব।

২

দইওয়ালা

দই—দই—ভালো দই !

অমল

দইওয়ালা, দইওয়ালা ও দইওয়ালা !

দইওয়ালা

ডাকছ কেন ? দই কিন্‌বে ?

অমল

কেমন করে' কিন্‌ব ? আমার ত পয়সা নেই।

দইওয়ালা

কেমন ছেলে তুমি ! কিন্‌বে না ত আমার বেলা বইয়ে দাও কেন ?

অমল

আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে' যেতে পারতুম ত যেতুম।

দইওয়ালা

আমার সঙ্গে ?

অমল

হাঁ। তুমি যে কতদূর থেকে হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে চলে' যাচ্চ শুনে আমার মন কেমন কর্‌চে !

দইওয়ালা

(দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা তুমি এখানে বসে' কি করচ ?

অমল

কবিরাজ আমাকে বেরতে বারণ করেচে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে' থাকি।

দইওয়ালা

আহা বাছা তোমার কি হয়েচে ?

অমল

আমি জানিনে। আমি ত কিছু পড়িনি তাই আমি জানিনে আমার কি হয়েচে। দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে আস্‌চ ?

দইওয়ালা

আমাদের গ্রাম থেকে আস্‌চি।

অমল

তোমাদের গ্রাম ? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম ?

দইওয়ালা

আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল

পাঁচমুড়া পাহাড়—শাম্‌লী নদী—কি জানি—হয় ত তোমাদের গ্রাম দেখেছি—কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওয়ালা

তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে না কি?

অমল

না, কোনোদিন যাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনো কালের খুব বড় বড় গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা

ঠিক বলেছ বাবা।

অমল

সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে' বেড়াচ্চে।

দইওয়ালা

কি আশ্চর্য্য! ঠিক বল্‌চ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বই কি, খুব চরে!

অমল

মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কল্‌সি করে' নিয়ে যায়—তাদের লাল সাড়ি পরা!

দইওয়ালা

বা! বা! ঠিক কথা! আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে ত নিয়ে যায়ই! তবে কি না,

তা'রা সবাই যে লাল সাড়ি পরে তা নয়—কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

অমল

সত্যি বলচি দইওয়ালা আমি একদিনও যাইনি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বল্‌বে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে ?

দইওয়ালা

যাব বই কি বাবা, খুব নিয়ে যাব।

অমল

আমাকে তোমার মত ঐ রকম দই বেচ্‌তে শিখিয়ে দিয়ো। ঐ রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে—ঐ রকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওয়ালা

মরে' যাই ! দই বেচতে যাবে কেন বাবা ? এত এত পুঁথি পড়ে' তুমি পণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

অমল

না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব ; কি রকম করে' তুমি বল, দই, দই, দই—ভালো দই ! আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও !

দইওয়ালা

হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল

না, না, ও আমার শুন্‌তে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখীর ডাক শুনলে মন উদাস হ'য়ে যায়—তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আস্‌ছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কি জানি কি মনে হচ্ছিল।

দইওয়ালা

বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও!

অমল

আমার ত পয়সা নেই।

দইওয়ালা

না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুসি হব।

অমল

তোমার কি অনেক দেরি হ'য়ে গেল?

দইওয়ালা

কিচ্ছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

(প্রস্থান)

অমল

(সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই ! সেই পাঁচ-মুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তা'রা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই।

দই, দই, দই—ই ভালো দই !—এই যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে' বেড়াচ্চে ! প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও না প্রহরী !

প্রহরী

অমন করে' ডাকাডাকি করচ কেন ? আমাকে ভয় কর না তুমি ?

অমল

কেন, তোমাকে কেন ভয় করব ?

প্রহরী

যদি তোমাকে ধরে' নিয়ে যাই ?

অমল

কোথায় ধরে' নিয়ে যাবে ? অনেক দূরে ? ঐ পাহাড় পেরিয়ে ?

প্রহরী

একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল

রাজার কাছে ? নিয়ে যাও না আমাকে ! কিন্তু

আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোথাও ধরে' নিয়ে যেতে পারবে না—আমাকে কেবল দিন রাত্রি এই খানেই বসে' থাক্‌তে হবে।

প্রহরী

কবিরাজ বারণ করেছে? আহা, তাই বটে—তোমার মুখ যেন শাদা হ'য়ে গেছে। চোখের কোলে কালী পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্চে।

অমল

তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী

এখনো সময় হয়নি।

অমল

কেউ বলে সময় ব'য়ে যাচ্চে, কেউ বলে সময় হয়নি। আচ্ছা তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই ত সময় হবে।

প্রহরী

সে কি হয়? সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল

বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা—আমার শুন্‌তে ভারি ভালো লাগে। দুপুর বেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হ'য়ে যায়—পিসে মশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের

ক্ষুদে কুকুরটা উঠোনের ঐ কোণের ছায়ায় ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমতে থাকে—তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে—ঢংঢংঢং, ঢংঢংঢং! তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?

প্রহরী

ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে' নেই, সময় কেবলি চলে' যাচ্চে।

অমল

কোথায় চলে' যাচ্চে? কোন্ দেশে?

প্রহরী

সে কথা কেউ জানে না।

অমল

সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসে নি? আমার ভারি ইচ্ছে করচে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে' যাই—যে দেশের কথা কেউ জানে না, সেই অনেক দূরে!

প্রহরী

সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা!

অমল

আমাকেও যেতে হবে?

প্রহরী

হবে বৈ কি।

অমল

কিন্তু কবিরাজ আমাকে যে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী

কোন্‌দিন কবিরাজই হয় ত স্বয়ং হাতে ধরে' নিয়ে যাবেন।

অমল

না, না, তুমি তাকে জান না, সে কেবলি ধরে' রেখে দেয়।

প্রহরী

তা'র চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল

আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আস্‌বেন? আমার যে আর বসে' থাক্‌তে ভালো লাগ্‌চে না।

প্রহরী

অমন কথা বল্‌তে নেই বাবা।

অমল

না—আমি ত বসেই আছি—যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আমি ত বেরই নে—কিন্তু তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢংঢংঢং—আর আমার মন কেমন করে। আচ্ছা প্রহরী!

প্রহরী

কি বাবা!

অমল

আচ্ছা, ঐ যে রাস্তার ওপারের বড় বাড়িতে নিশেন

উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলি আস্‌চে যাচ্চে—ওখানে কি হয়েছে!

প্রহরী

ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল

ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী

ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর।—এ ছেলেটি ভারি মজার!

অমল

রাজার ডাকঘরে রাজার কাছে থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী

আসে বই কি। দেখো একদিন তোমার নামেও চিঠি আস্‌বে!

অমল

আমার নামেও চিঠি আস্‌বে? আমি যে ছেলেমানুষ!

প্রহরী

ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকুটুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল

বেশ হবে! আমি কবে চিঠি পাব! আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে’ জানলে?

প্রহরী

তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জান্‌লাটার সাম্‌নেই অত বড় একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুল্‌তে যাবেন কেন? ছেলেটাকে আমার বেশ লাগ্‌চে।

অমল

আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে?

প্রহরী

রাজার যে অনেক ডাকহরকরা আছে—দেখ নি বুকে গোল গোল সোনার তকমা পরে' তা'রা ঘুরে বেড়ায়।

অমল

আচ্ছা, কোথায় তা'রা ঘোরে?

প্রহরী

ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।—এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।

অমল

বড় হ'লে আমি রাজার ডাকহরকরা হব।

প্রহরী

হা হা হা হা! ডাকহরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, গরীব নেই, বড়মানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে' বেড়ানো—সে খুব জবর কাজ!

অমল

তুমি হাস্‌চ কেন? আমার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগ্‌চে। না না তোমার কাজও খুব ভালো—দুপুর বেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁঝাঁ করে তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—আবার এক একদিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাহিরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজ্‌চে ঢং ঢং ঢং!

প্রহরী

ঐ যে মোড়ল আস্‌চে—আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গল্প করচি তাহ'লেই মুস্কিল বাধাবে।

অমল

কই মোড়ল, কই, কই?

প্রহরী

ঐ যে অনেক দূরে! মাথায় একটা মস্ত গোলপাতার ছাতি।

অমল

ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে' দিয়েছে?

প্রহরী

আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই

ও আপনার ব্যবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্চে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত সহরের খবর শুনিয়ে যাব।

(প্রস্থান)

অমল

রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে' চিঠি যদি পাই তাহ'লে বেশ হয়—এই জানালার কাছে বসে' বসে' পড়ি। কিন্তু আমি ত পড়তে পারিনে। কে পড়ে' দেবে? পিসিমা ত রামায়ণ পড়ে! পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে? কেউ যদি পড়তে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড় হ'লে পড়ব। কিন্তু ডাকহরকরা যদি আমাকে না চেনে! মোড়ল মশায়, ও মোড়ল মশায়—একটা কথা শুনে যাও!

মোড়ল

কে রে! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে! কোথাকার বাঁদর এটা!

অমল

তুমি মোড়ল মশায়, তোমাকে ত সবাই মানে!

মোড়ল

(খুসি হইয়া)

হাঁ, হাঁ, মানে বই কি! খুব মানে!

অমল

রাজার ডাকহরকরা তোমার কথা শোনে?

মোড়ল

না শুনে তা'র প্রাণ বাঁচে! বাস্‌রে! সাধ্য কি!

অমল

তুমি ডাকহরকরাকে বলে' দেবে আমারি নাম অমল—আমি এই জান্‌লার কাছটাতে বসে' থাকি।

মোড়ল

কেন বল দেখি?

অমল

আমার নামে যদি চিঠি আসে—

মোড়ল

তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখ্‌বে?

অমল

রাজা যদি চিঠি লেখে তাহ'লে—

মোড়ল

হা হা হা হা! এ ছেলেটা ত কম নয়! হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখ্‌বে! তা লিখ্‌বে বই কি! তুমি যে তা'র পরম বন্ধু! ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা না হ'য়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্চে, খবর পেয়েছি! আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয় ত আজই আসে কি কালই আসে!

অমল

মোড়লমশায়, তুমি অমন করে' কথা কচ্চ কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মোড়ল

বাস্‌রে! তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!—মাধব দত্তর বড় বাড় হয়েছে দেখচি! দুপয়সা জমিয়েছে কি না, এখন তা'র ঘরে রাজা বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোস না, ওকে মজা দেখাচ্চি! ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে আমি তা'র বন্দোবস্ত করচি।

অমল

না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল

কেন রে! তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব—তিনি তা'হলে আর দেরি করতে পারবেন না—তোমাদের খবর নেওয়ার জন্যে এখনি পাইক পাঠিয়ে দেবেন!—না, মাধব দত্তর ভারি আস্পর্দ্ধা—রাজার কানে একবার উঠ্‌লে দুরস্ত হ'য়ে যাবে।

(প্রস্থান)

অমল

কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ? একটু দাঁড়াও না ভাই।

(বালিকার প্রবেশ)

বালিকা

আমার কি দাঁড়াবার জো আছে! বেলা ব'য়ে যায় যে।

অমল

তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করচে না—আমারো এখানে আর বসে' থাক্‌তে ইচ্ছা করে না।

বালিকা

তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্চে যেন সকাল বেলাকার তারা—তোমার কি হয়েছে বল ত!

অমল

জানি নে কি হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরতে বারণ করেছে।

বালিকা

আহা, তবে বেরিয়ো না—কবিরাজের কথা মেনে চল্‌তে হয়—দুরন্তপনা করতে নেই, তা হ'লে লোকে দুষ্টু বল্‌বে! বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটফট করচে আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে' দিই।

অমল

না, না, বন্ধ কোরো না—ওখানে আমার আর সব বন্ধ কেবল এইটুকু খোলা। তুমি কে বল না—আমি ত তোমাকে চিনিনে।

বালিকা

আমি সুধা।

অমল

সুধা!

সুধা

জান না, আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে।

অমল

তুমি কি কর ?

সুধা

সাজি ভরে' ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুল্‌তে চলেছি।

অমল

ফুল তুল্‌তে চলেছ ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুসি হ'য়ে উঠেছে—যতই চলেছ মল বাজ্‌চে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তাহ'লে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।

সুধা

তাই বই কি ! ফুলের খবর আমার চেয়ে তুমি না কি বেশি জান !

অমল

জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি ! আমার মনে হয় আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তাহ'লে আমি চলে' যেতে পারি—খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব আগায় যেখানে মনুয়া পাখী বসে' বসে' দোলা খায় সেইখানে আমি

চাঁপা হ'য়ে ফুট্‌তে পারি। তুমি আমার পারুল দিদি হবে?

স্থধা

কি বুদ্ধি তোমার! পারুল দিদি আমি কি করে' হব! আমি যে স্থধা—আমি শশিমালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। আমি যদি তোমার মত এইখানে বসে' থাক্‌তে পার্‌তুম তাহ'লে কেমন মজা হ'ত!

অমল

তাহ'লে সমস্ত দিন কি কর্‌তে?

স্থধা

আমার বেনে বউ পুতুল আছে তা'র বিয়ে দিতুম। আমার পুসি মেনি আছে, তাকে নিয়ে—যাই বেলা ব'য়ে যাচ্ছে, দেরি হ'লে ফুল আর থাক্‌বে না।

অমল

আমার সঙ্গে আর একটু গল্প কর না, আমার খুব ভালো লাগ্‌চে।

স্থধা

আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হ'য়ে এইখানে স্থির হ'য়ে বসে থাক, আমি ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে' যাব।

অমল

আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা

ফুল অম্‌নি কেমন করে’ দেব ? দাম দিতে হবে যে।

অমল

আমি যখন বড় হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে’ যাব ঐ ঝরণা পার হ’য়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা

আচ্ছা বেশ।

অমল

তুমি তাহ’লে ফুল তুলে আস্‌বে ?

সুধা

আস্‌ব।

অমল

আস্‌বে ?

সুধা

আস্‌ব।

অমল

আমাকে ভুলে যাবে না ? আমার নাম অমল। মনে থাক্‌বে তোমার ?

সুধা

না, ভুল্‌ব না। দেখো, মনে থাক্‌বে।

(প্রস্থান)

(ছেলের দলের প্রবেশ)

অমল

ভাই তোমরা সব কোথায় যাচ্চ ভাই। একবার একটু-খানি এইখানে দাঁড়াও না!

ছেলেরা

আমরা খেল্‌তে চলেছি।

অমল

কি খেল্‌বে তোমরা ভাই ?

ছেলেরা

আমরা চাষ খেলা খেলব।

১ম

(লাঠি দেখাইয়া) এই যে আমাদের লাঙল।

২য়

আমরা দুজনে দুই গোরু হব।

অমল

সমস্ত দিন খেলবে ?

ছেলেরা

হাঁ সমস্ত দি—ন।

অমল

তা'র পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আস্‌বে ?

ছেলেরা

হাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব!

অমল

আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই।

ছেলেরা

তুমি বেরিয়ে এস না খেল্‌বে চল।

অমল

কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা

কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি। চল্ ভাই চল্ আমাদের দেরি হ'য়ে যাচ্চে!

অমল

না ভাই, তোমরা আমার এই জান্‌লার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা কর—আমি একটু দেখি।

ছেলেরা

এখেনে কি নিয়ে খেল্‌ব!

অমল

এই যে আমার সব খেলনা পড়ে' রয়েছে—এ সব তোমরাই নাও ভাই—ঘরের ভিতরে একলা খেল্‌তে ভালো লাগে না—এ সব ধূলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে—এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা

বা, বা, বা, কি চমৎকার খেলনা! এযে জাহাজ! এযে জটাইবুড়ি! দেখছিস্‌ ভাই কেমন সুন্দর সেপাই। এ সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে? তোমার কষ্ট হচ্চে না?

অমল

না, কিছু কষ্ট হচ্চে না, সব তোমাদের দিলুম!

ছেলেরা

আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল

না, ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা

কেউ ত বক্‌বে না?

অমল

কেউ না, কেউ না! কিন্তু রোজ সকালে তোমরা এই খেলনাগুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিকক্ষণ ধরে' খেলো। আবার এগুলো যখন পুরোনো হ'য়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা

বেশ ভাই আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই সেপাইগুলোকে এখানে সব সাজা—আমরা লড়াই লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই?—ঐ যে একটা মস্ত শরকাঠি

পড়ে’ আছে—ঐটেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়চ!

অমল

হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আস্‌চে। জানিনে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে’ আছি আমি আর বসে’ থাক্‌তে পারচিনে—আমার পিঠ ব্যথা করচে।

ছেলেরা

এখন যে সবে এক প্রহর বেলা—এখনি তোমার ঘুম পায় কেন? ঐ শোন এক প্রহরের ঘণ্টা বাজচে।

অমল

হাঁ, ঐ যে বাজচে ঢং ঢং ঢং—আমাকে ঘুমতে যেতে ডাক্‌চে।

ছেলেরা

তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আস্‌ব।

অমল

যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই। তোমরা ত বাইরে থাক তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাকহরকরাদের চেন?

ছেলেরা

হাঁ চিনি বই কি, খুব চিনি।

অমল

কে তা’রা, নাম কি?

ছেলেরা

একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ,—আরো কত আছে।

অমল

আচ্ছা আমার নামে যদি চিঠি আসে তা'রা কি আমাকে চিন্‌তে পারবে ?

ছেলেরা

কেন পারবে না ? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তা'রা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে।

অমল

কাল সকালে যখন আস্‌বে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ো না !

ছেলেরা

আচ্ছা দেব।

৩

অমল শয্যাগত

অমল

পিসে মশায়, আজ আর আমার সেই জান্‌লার কাছেও যেতে পারব না ? কবিরাজ বারণ করেছে ?

মাধব দত্ত

হাঁ বাবা। সেখানে রোজ রোজ বসে' থেকেই ত তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে।

অমল

না পিসে মশায়, না,—আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানিনে কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।

মাধব দত্ত

সেখানে বসে' বসে' তুমি এই সহরের যত রাজ্যের ছেলে-বুড়ো সকলের সঙ্গেই ভাব করে' নিয়েছ—আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মস্ত মেলা বসে' যায়—এতেও কি কখনো শরীর টেঁকে! দেখ দেখি আজ তোমার মুখখানা কি রকম ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে!

অমল

পিসে মশায়, আমার সেই ফকির হয় ত আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেয়ে চলে' যাবে।

মাধব দত্ত

তোমার আবার ফকির কে?

অমল

সেই যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশ-বিদেশের কথা বলে' যায়—শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত

কই আমি ত কোনো ফকিরকে জানিনে।

অমল

এই ঠিক তা'র আসবার সময় হয়েছে—তোমার পায়ে পড়ি তুমি তাকে একবার বলে' এস না, সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে!

(ফকিরবেশে ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

অমল

এই যে, এই যে ফকির—এস আমার বিছানায় এসে বস।

মাধব দত্ত

একি! এ যে—

ঠাকুর্দ্দা

(চোখ ঠারিয়া) আমি ফকির।

মাধব দত্ত

তুমি যে কি নও তা' ত ভেবে পাইনে।

অমল

এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির ?

ফকির

আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলুম—সেইখান থেকেই এই-মাত্র আস্‌চি।

মাধব দত্ত

ক্রৌঞ্চদ্বীপে ?

ফকির

এতে আশ্চর্য্য হও কেন ? তোমাদের মত আমাকে পেয়েছ ? আমার ত যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুসি যেতে পারি।

অমল

(হাততালি দিয়া) তোমার ভারি মজা ! আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে' নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির !

ফকির

খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধব দত্ত

এসব কি পাগলের মত কথা হচ্চে তোমাদের ?

ঠাকুর্দ্দা

বাবা অমল, পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্রকে ভয় করিনে—কিন্তু তোমার এই পিসেটির সঙ্গে যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তাহ'লে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে !

অমল

না, না, পিসে মশায় তুমি কবিরাজকে কিছু বোলো না !—এখন আমি এইখানেই শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করব না—কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেইদিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে' যাব—নদী পাহাড় সমুদ্রে আমাকে আর ধরে' রাখতে পারবে না।

মাধব দত্ত

ছি বাবা, কেবলি অমন যাই যাই করতে নেই—শুনলে আমার মন কেমন খারাপ হ'য়ে যায়।

অমল

ক্রৌঞ্চদ্বীপ কি রকম দ্বীপ আমাকে বল না ফকির ?

ঠাকুর্দ্দা

সে ভারি আশ্চর্য্য জায়গা। সে পাখীদের দেশ—সেখানে মানুষ নেই। তা'রা কথা কয় না, চলে না, তা'রা গান গায় আর ওড়ে।

অমল

বাঃ কি চমৎকার! সমুদ্রের ধারে?

ঠাকুর্দ্দা

সমুদ্রের ধারে বই কি?

অমল

সব নীলরঙের পাহাড় আছে?

ঠাকুর্দ্দা

নীল পাহাড়েই ত তাদের বাসা। সন্ধ্যের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্য্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখী তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে—সেই আকাশের রঙে পাখীর রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হ'য়ে ওঠে।

অমল

পাহাড়ে ঝরণা আছে?

ঠাকুর্দ্দা

বিলক্ষণ? ঝরণা না থাক্‌লে কি চলে! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্চে! আর তা'র কি নৃত্য! নুড়ি-গুলোকে ঠুং ঠাং ঠুং ঠাং করে' বাজাতে বাজাতে কেবলি কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরণাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়চে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আট্‌কে রাখে। পাখীগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে' যদি একঘরে করে'

না রাখত তাহ'লে ঐ ঝরণার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল

আমি যদি পাখী হতুম তাহ'লে—

ঠাকুর্দ্দা

তাহ'লে একটা ভারি মুস্কিল হ'ত। শুনলুম তুমি নাকি দইওয়ালাকে বলে' রেখেছ বড় হ'লে তুমি দই বিক্রী করবে —পাখীদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যবসাটা তেমন বেশ জম্‌ত না। বোধহয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হ'ত!

মাধব দত্ত

আর ত আমার চল্‌ল না! আমাকে স্থদ্ধ তোমরা ক্ষেপিয়ে দেবে দেখচি! আমি চল্লুম!

অমল

পিসে মশায়, আমার দইওয়ালা এসে চলে' গেছে?

মাধব দত্ত

গেছে বই কি। তোমার ঐ সখের ফকিরের তল্পী ব'য়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখীর বাসায় উড়ে বেড়ালে তা'র ত পেট চলে না! সে তোমার জন্য এক ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে' গেছে তাদের গ্রামে তা'র বোন্‌ঝির বিয়ে—তাই সে কলমিপাড়ায় বাঁশির ফরমাস দিতে যাচ্চে—তাই বড় ব্যস্ত আছে।

অমল

সে যে বলেছিল আমার সঙ্গে তা'র ছোট বোন্‌ঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুর্দ্দা

তবে ত বড় মুস্কিল দেখচি।

অমল

বলেছিল সে আমার টুক্‌টুকে বউ হবে—তা'র নাকে নোলক, তা'র লাল ডুরে শাড়ি। সে সকাল বেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধ্যের সময় গোয়াল ঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে' সাত ভাই চম্পার গল্প করবে।

ঠাকুর্দ্দা

বা, বা, খাসা বউ ত! আমি যে ফকির মানুষ আমারি লোভ হয়। তা বাবা, ভয় নেই, এবারকার মত বিয়ে দিক না, আমি তোমাকে বলচি, তোমার দরকার হ'লে কোনোদিন ওর ঘরে বোন্‌ঝির অভাব হবে না।

মাধব দত্ত

যাও, যাও! আর ত পারা যায় না।

(প্রস্থান)

অমল

ফকির, পিসে মশায় ত গিয়েছেন—এইবার আমাকে

চুপিচুপি বল না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে ?

ঠাকুর্দ্দা

শুনেছি ত তাঁর চিঠি রওনা হ'য়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে।

অমল

পথে ? কোন পথে ? সেই যে বৃষ্টি হ'য়ে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেলে অনেকদূরে দেখা যায় সেই ঘন বনের পথে ?

ঠাকুর্দ্দা

তবে ত তুমি সব জান দেখ্‌চি, সেই পথেই ত।

অমল

আমি সব জানি ফকির।

ঠাকুর্দ্দা

তাই ত দেখতে পাচ্চি—কেমন করে' জানলে ?

অমল

তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেচি—সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব ? আমি দেখতে পাচ্চি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আস্‌চে—বাঁ হাতে তা'র লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কতদিন কতরাত ধরে' সে কেবলি

নেমে আস্‌চে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে' সে কেবলি চলে' আসচে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত; তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আস্‌চে—তা'র পরে আখের ক্ষেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে' গিয়েছে সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চলে' আস্‌চে—রাতদিন একলাটি চলে' আস্‌চে; ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাক্‌চে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদা-খোঁচা ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্চে—আমি সমস্ত দেখ্‌তে পাচ্চি। যতই সে আস্‌চে দেখচি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুসি হ'য়ে হ'য়ে উঠচে।

ঠাকুর্দ্দা

অমন নবীন চোখ ত আমার নেই তবু্ তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্চি।

অমল

আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?

ঠাকুর্দ্দা

জানি বই কি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল

সে ত বেশ। আমি ভালো হ'য়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব! পারব না যেতে?

ঠাকুর্দ্দা

বাবা তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল

না, না, আমি তাঁর দরজার সাম্‌নে পথের ধারে দাঁড়িয়ে জয় হোক্ বলে ভিক্ষা চাইব—আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব—সে বেশ হবে না ?

ঠাকুর্দ্দা

সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে' ভিক্ষা মিল্‌বে। তুমি কি ভিক্ষা চাইবে ?

অমল

আমি বল্‌ব আমাকে তোমার ডাকহরকরা করে' দাও আমি অম্‌নি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে' বেড়াব। জান ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভালো হ'য়ে উঠ্‌লে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। আমি তা'র সঙ্গে যেখানে খুসি ভিক্ষা করে' বেড়াব।

ঠাকুর্দ্দা

কে বল দেখি ?

অমল

ছিদাম।

ঠাকুর্দ্দা

কোন্ ছিদাম ?

অমল

সেই যে অন্ধ খোঁড়া। সে রোজ আমার জান্‌লার কাছে আসে। ঠিক আমার মত একজন ছেলে তা'কে চাকার গাড়িতে করে' ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তা'কে বলেছি আমি ভালো হ'য়ে উঠ্‌লে তা'কে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুর্দ্দা

সে ত বেশ মজা হবে দেখ্‌চি।

অমল

সেই আমাকে বলেছে কেমন করে' ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসে মশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে, তিনি বলেন ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা ও যেন মিথ্যা কানাই হ'ল কিন্তু চোখে দেখ্‌তে পায় না সেটা ত সত্যি।

ঠাকুর্দ্দা

ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্চে ঐটুকু যে, ও চোখে দেখ্‌তে পায় না—তা ওকে কানা বল আর নাই বল। তা ও ভিক্ষা পায় না তবে তোমার কাছে বসে' থাকে কি করতে?

অমল

ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কি আছে! বেচারা দেখ্‌তে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বল

সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হাল্কা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিষের কোনো ভার নেই—যেখানে একটু লাফ দিলেই অম্‌নি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে' যাওয়া যায় সেই হাল্কা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুসি হ'য়ে উঠেছিল। আচ্ছা ফকির সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়?

ঠাকুর্দ্দা

ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে সে হয় ত খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল

ও বেচারা যে অন্ধ ও হয় ত দেখ্‌তেই পাবে না—ওকে কেবল ভিক্ষাই করে' বেড়াতে হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল—আমি ওকে বল্লুম ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই ত সে পায় না।

ঠাকুর্দ্দা

বাবা ঘরে বসে' থাক্‌লেই বা কিসের দুঃখ!

অমল

না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরচ্চে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে বসে' বসেই ভালো লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে করলেই

আমি খুব খুসি হ'য়ে চুপ করে' বসে' থাক্‌তে পারি। কিন্তু রাজার চিঠিতে কি যে লেখা থাক্‌বে তা'ত আমি জানিনে।

ঠাকুর্দ্দা

তা নাই জান্‌লে। তোমার নামটি ত লেখা থাক্‌বে—তাহ'লেই হ'ল।

(মাধব দত্তের প্রবেশ)

মাধব দত্ত

তোমরা দুজনে মিলে এ কি ফ্যাসাদ্ বাধিয়ে বসে' আছ বল দেখি!

ঠাকুর্দ্দা

কেন হয়েছে কি?

মাধব দত্ত

শুন্‌চি, তোমরা নাকি রটিয়েছ রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখ্‌বেন বলে' ডাকঘর বসিয়েছেন!

ঠাকুর্দ্দা

তা'তে হয়েচে কি?

মাধব দত্ত

আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা

সকল কথাই রাজার কানে ওঠে সেকি আমরা জানিনে।

মাধব

তবে সামলে চল না কেন ? রাজা বাদশার নাম করে’ অমন যা-তা কথা মুখে আন কেন ? তোমরা যে আমাকে সুদ্ধ মুস্কিলে ফেল্‌বে !

অমল দত্ত

ফকির, রাজা কি রাগ করবে।

ঠাকুর্দ্দা

অম্‌নি বল্লেই হ’ল ! রাগ করবে ! কেমন রাগ করে দেখি না ! আমার মত ফকির আর তোমার মত ছেলের উপর রাগ করে’ সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে !

অমল

দেখ ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হ’য়ে আস্‌চে, মনে হচ্চে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে’ থাক্‌তে ইচ্ছে করচে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করচে না। রাজার চিঠি কি আস্‌বে না ? এখনি এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়—যদি—

ঠাকুর্দ্দা

(অমলকে বাতাস করিতে করিতে)

আস্‌বে, চিঠি আজই আস্‌বে।

(কবিরাজের প্রবেশ)

কবিরাজ

আজ কেমন ঠেক্‌চে ?

অমল

কবিরাজমশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্চে—মনে হচ্চে যেন সব বেদনা চলে’ গেছে।

কবিরাজ

(জনান্তিকে মাধব দত্তের প্রতি) ঐ হাসিটি ত ভালো ঠেক্‌চে না। ঐ যে বলচে খুব ভালো বোধ হ’চ্চে ঐটেই হ’ল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধর দত্ত বলচেন—

মাধব দত্ত

দোহাই কবিরাজমশায়, চক্রধর দত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলুন্‌ ব্যাপারখানা কি!

কবিরাজ

বোধ হচ্চে আর ধরে’ রাখা যাবে না। আমি ত নিষেধ করে’ গিয়েছিলুম কিন্তু বোধ হচ্চে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব দত্ত

না কবিরাজমশায়, আমি ওকে খুব করেই চারিদিক থেকে আগ্‌লে সাম্‌লে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিইনে —দরজা ত প্রায়ই বন্ধই রাখি!

কবিরাজ

হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে—আমি দেখে এলুম তোমাদের সদর দরজার ভিতর দিয়ে হু হু করে’ হাওয়া বইচে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও দরজাটা বেশ ভালো করে’ তালাচাবি বন্ধ করে’ দাও। না হয় দিন দুই তিন

তোমাদের এখানে লোক আনাগোনা বন্ধই থাক্ না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি দরজা আছে। ঐ যে জান্‌লা দিয়ে সূর্য্যাস্তের আভাটা আস্‌চে ওটাও বন্ধ করে’ দাও, ওতে রোগীকে বড় জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত

অমল চোখ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমচ্চে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন—কবিরাজমশায়, যে আপনার নয় তা'কে ঘরে এনে রাখ্‌লুম, তা'কে ভালবাসলুম, এখন বুঝি আর তা'কে রাখ্‌তে পারব না।

কবিরাজ

ও কি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আস্‌চে। এ কি উৎপাত! আমি আসি ভাই। কিন্তু তুমি যাও এখনি ভালো করে’ দরজাটা বন্ধ করে’ দাও! আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্চি—সেইটে খাইয়ে দেখ—যদি রাখবার হয় ত সেইটেতেই টেনে রাখ্‌তে পারবে!

(মাধব দত্ত ও কবিরাজের প্রস্থান)

(মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল

কি রে ছোঁড়া!

ঠাকুর্দ্দা

(তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

আরে আরে চুপ্ চুপ্!

অমল

না ফকির! তুমি ভাব্‌চ আমি ঘুমচ্চি! আমি ঘুমইনি। আমি সব শুন্‌চি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুন্‌তে পাচ্চি। আমার মনে হচ্চে আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্চেন!

(মাধব দত্তের প্রবেশ)

মোড়ল

ওহে মাধব দত্ত, আজ কাল তোমাদের যে খুব বড় বড় লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ!

মাধব দত্ত

বলেন কি, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল

তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে' আছে।

মাধব দত্ত

ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল

না, না, এতে আর আশ্চর্য্য কি! তোমাদের মত এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? সেই জন্যই দেখচ না, ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে! ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে!

অমল

(চমকিয়া উঠিয়া) সত্যি ?

মোড়ল

একি সত্যি না হ'য়ে যায় ! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব ! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হাহাহাহা, এই যে তাঁর চিঠি ।

অমল

আমাকে ঠাট্টা কোরো না । ফকির, ফকির, তুমি বল না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি ?

ঠাকুর্দ্দা

হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বল্‌চি এই সত্য তাঁর চিঠি !

অমল

কিন্তু আমি যে এতে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে—আমার চোখে আজ সব শাদা হ'য়ে গেছে ! মোড়লমশায় বলে' দাও না এ চিঠিতে কি লেখা আছে !

মোড়ল

রাজা লিখ্‌চেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্চি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়িমুড়কির ভোগ তৈরি করে' রেখো—রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগ্‌চে না । হাহাহাহা ।

মাধব দত্ত

(হাত জোড় করিয়া) মোড়লমশায় দোহাই আপনার, এসব কথা নিয়ে পরিহাস করবেন না !

ঠাকুর্দ্দা

পরিহাস ! কিসের পরিহাস ! পরিহাস করেন এমন সাধ্য আছে ওঁর !

মাধব দত্ত

আরে ! ঠাকুর্দ্দা, তুমিও ক্ষেপে গেলে নাকি !

ঠাকুর্দ্দা

হাঁ, আমি ক্ষেপেছি ! তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি। রাজা লিখ্‌চেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখ্‌তে আস্‌চেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে' আন্‌চেন।

অমল

ফকির, ঐ যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজ্‌চে, শুন্‌তে পাচ্চ না ?

মোড়ল

হাহাহাহা ! উনি আরো একটু না ক্ষেপলে ত শুন্‌তে পাবেন না।

অমল

মোড়লমশায়, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেচ—তুমি আমাকে ভালবাস না। তুমি যে সত্যি

রাজার চিঠি আন্‌বে এ আমি মনে করিনি—দাও আমাকে তোমার পায়ের ধূলো দাও।

মোড়ল

না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে কিন্তু মনটা ভালো।

অমল

এতক্ষণে চার প্রহর হ'য়ে গেছে বোধ হয়! ঐ যে ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং! সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখ্‌তে পাচ্চিনে?

ঠাকুর্দ্দা

ওরা যে জান্‌লা বন্ধ করে' দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্চি!

(বাহিরের দ্বারে আঘাত)

মাধব দত্ত

ও কি ও! ও কেও! এ কি উৎপাত!

বাহির হইতে

খোল দ্বার!

মাধব দত্ত

কে তোমরা?

বাহির হইতে

খোল দ্বার!

মাধব দত্ত

মোড়লমশায়! এ ত ডাকাত নয়?

মোড়ল

কে রে! আমি পঞ্চানন মোড়ল! তোদের মনে ভয় নেই নাকি। দেখ একবার; শব্দ থেমেছে! পঞ্চাননের আওয়াজ পেলে আর রক্ষা নেই! যত বড় ডাকাতই হোক্ না—

মাধব দত্ত

(জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) দ্বার যে ভেঙে ফেলেছে তাই আর শব্দ নেই!

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত

মহারাজ আজ রাত্রে আস্‌বেন।

মোড়ল

কি সর্ব্বনাশ!

অমল

কতরাত্রে দূত? কত রাত্রে?

রাজদূত

আজ দুই প্রহর রাত্রে।

অমল

যখন আমার বন্ধু প্রহরী নগরের সিংহদ্বারে ঘণ্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং—তখন?

রাজদূত

হাঁ, তখন! রাজা তাঁর বালক বন্ধুটিকে দেখবার

জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড় কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

(রাজকবিরাজের প্রবেশ)

রাজকবিরাজ

এ কি! চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার জান্‌লা আছে সব খুলে দাও! (অমলের গায়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করচ?

অমল

খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজমশায়! আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ সব খুলে দিয়েছ,—সব তারাগুলি দেখ্‌তে পাচ্চি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা!

কবিরাজ

অর্দ্ধরাত্রে যখন রাজা আস্‌বেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরতে পারবে?

অমল

পারব আমি পারব! বেরতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি কিন্তু সে যে কোন্‌টা সে ত আমি চিনিনে।

কবিরাজ

তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। (মাধব দত্তের প্রতি) এই

ঘরটি রাজার আগমনের জন্য পরিষ্কার করে' ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখ! (মোড়লকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ লোকটিকে ত এ ঘরে রাখা চল্‌বে না!

অমল

না, না, কবিরাজমশায়, উনি আমার বন্ধু! তোমরা যখন আসনি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।

কবিরাজ

আচ্ছা, বাবা, উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এ ঘরে রইলেন।

মাধব দত্ত

(অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালবাসেন তিনি স্বয়ং আজ আস্‌চেন—তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো! আমাদের অবস্থা ত ভালো নয়! জান ত সব।

অমল

সে আমি ঠিক করে' রেখেছি পিসে মশায়—সে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

মাধব দত্ত

কি ঠিক করেছ বাবা?

অমল

আমি তাঁর কাছে চাইব তিনি যেন আমাকে তাঁর

ডাকঘরের হরকরা করে' দেন—আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধব দত্ত

(ললাটে করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল !

অমল

পিসে মশায় রাজা আস্‌বেন, তাঁর জন্যে কি ভোগ তৈরি রাখ্‌বে ?

রাজদূত

তিনি বলে' দিয়েছেন তোমাদের এখানে তাঁর মুড়ি-মুড়কির ভোগ হবে।

অমল

মুড়িমুড়কি ! মোড়লমশায়, তুমি ত আগেই বলে' দিয়েছিলে, রাজার সব খবরই তুমি জান ! আমরা ত কিছুই জানতুম না !

মোড়ল

আমার বাড়িতে যদি লোক পাঠিয়ে দাও তাহ'লে রাজার জন্যে ভালো ভালো কিছু—

কবিরাজ

কোনো দরকার নেই ! এইবার তোমরা সকলে স্থির হও ! এল, এল, ওর ঘুম এল ! আমি বালকের শিয়রের কাছে বস্‌ব—ওর ঘুম আস্‌চে ! প্রদীপের আলো নিবিয়ে

দাও—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক্! ওর ঘুম এসেছে।

মাধব দত্ত

(ঠাকুর্দ্দার প্রতি) ঠাকুর্দ্দা তুমি অমন মূর্ত্তিটির মত হাতজোড় করে' নীরব হ'য়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্চে! এ যা দেখ্‌চি এ সব কি ভালো লক্ষণ? এরা আমার ঘর অন্ধকার করে' দিচ্চে কেন? তারার আলোতে আমার কি হবে!

ঠাকুর্দ্দা

চুপ কর অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না!

(সুধার প্রবেশ)

সুধা

অমল!

কবিরাজ

ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা

আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না?

কবিরাজ

আচ্ছা, দাও তোমার ফুল!

সুধা

ও কখন্ জাগ্‌বে?

কবিরাজ

এখনি যখন রাজা এসে ওকে ডাক্‌বেন।

সুধা

তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে' দেবে?

কবিরাজ

কি বল্‌ব?

সুধা

বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলেনি।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি

১

আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

১৩১৩

২

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে' বাঁচালে মোরে !
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে'।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়,
সে মহা দানেরই যোগ্য করে',
অতি ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে !

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি,
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে' ;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হ'তে
যাও যে সরে' !
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে' ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তবে মিলনেরই যোগ্য করে',
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে !

১৩১৩।

৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে,
যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

১৩১৩।

৪

বিপদে মোরে রক্ষা কর,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি'
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

১৩১৩।

৫

অন্তর মম বিকশিত কর

অন্তরতর হে।

নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর,

সুন্দর কর হে।

জাগ্রত কর, উদ্যত কর,

নির্ভয় কর হে।

মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।

অন্তর মম বিকশিত কর

অন্তরতর হে।

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,

মুক্ত কর হে বন্ধ,

সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে

শান্ত তোমার ছন্দ।

চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,

নন্দিত কর, নন্দিত কর

নন্দিত কর হে।

অন্তর মম বিকশিত কর

অন্তরতর হে॥

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তা'র চরণে তোমাব ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

৭

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস গন্ধে বরণে, এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এস হে বিচিত্র বিধানে।
এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে ;
এস সকল কর্ম্ম অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে॥

অগ্রহায়ণ, ১৩১৪

৮

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে।
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন কাজে ;
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে ॥

১৩১৫।

৯

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে ?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তা'রা
বসিবে নানা সাজে।

নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে॥

আষাঢ়, ১৩১৬।

১০

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে' আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে
আজ আমি যে বসে' আছি
তোমারি আশ্বাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

তুমি যদি না দেখা দাও
　　কর আমায় হেলা,
কেমন করে' কাটে আমার
　　এমন বাদল বেলা।
　　　　দূরের পানে মেলে আঁখি
　　　　কেবল আমি চেয়ে থাকি
　　　　পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
　　　　　দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
　　একা দ্বারের পাশে॥

আষাঢ়, ১৩১৬

১১

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো !
বিরহানলে জ্বালো রে তা'রে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

বেদনা দূতী গাহিছে "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি ;
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে ;
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো !
বিরহানলে জ্বালো রে তা'রে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো ॥

আষাঢ়, ১৩১৬।

১২

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে?

কূজনহীন কাননভূমি,
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে॥

আষাঢ়, ১৩১৬।

১৩

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,

গেল রে দিন ব'য়ে।

বাঁধন হারা বৃষ্টি-ধারা

ঝরচে র'য়ে র'য়ে।

একলা বসে' ঘরের কোণে

কি ভাবি যে আপন মনে,

সজল হাওয়া যূথীর বনে

কি কথা যায় ক'য়ে।

বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা

ঝরচে র'য়ে র'য়ে।

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
খুঁজে না পাই কূল ;
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হ'য়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরচে র'য়ে র'য়ে॥

আষাঢ়, ১৩১৬

১৪

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

আকাশ কাঁদে হতাশ সম,

নাই যে ঘুম নয়নে মম,

দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,

চাই যে বারে বার।

পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,

তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।

সুদূর কোন্ নদীর পারে,

গহন কোন্ বনের ধারে,

গভীর কোন্ অন্ধকারে

হতেছ তুমি পার,

পরাণসখা বন্ধু হে আমার॥

আষাঢ়, ১৩১৬।

১৫

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।

সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।

কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরষণ॥

১০ই ভাদ্র, ১৩১৬।

১৬

তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী
অবাক হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি।

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।

মনে করি অম্‌নি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই

কইতে কি চাই, কইতে কথা বাধে;
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি॥

১০ই ভাদ্র, ১৩১৬।

১৭

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো
কেউ জানবে না কেউ বলবে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বল আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না।

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না ?
না হয় আমার নাই সাধনা ;
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল
চকিতে ফল ফলবে না ?
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না ॥

১১ই ভাদ্র, ১৩১৬।

১৮

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই,
শয়নে স্বপনে।

এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু'হাত ভরে' ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যদি আলস ভরে
আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই,
শয়নে স্বপনে॥

১৯

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে

সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণ ধারায়
তোমার বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায় কত বাসনায়
কত সুখে দুখে কাজে হে

সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে।

১২ই ভাদ্র, ১৩১৬।

২০

আর নাই রে বেলা নামল ছায়া
ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে, কলসখানি
ভরে' নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে
সেই ধ্বনিতে
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে' নিতে।

এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।
জানিনে আর ফিরব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
চল্ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে’ নিতে॥

১৩ই ভাদ্র, ১৩১৬।

২১

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে!

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।
আজ এমন করে' কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে॥

১৪ই ভাদ্র, ১৩১৬।

২২

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

ধূলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারী হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে।
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

আজি এ জগত মাঝে
কত সুখে কত কাজে
চলে' গেল সবে আগে।
সাথী নাই পাই
তোমায় চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে।
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে॥

১৪ই ভাদ্র, ১৩১৬

২৬

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়
তবু জান, মন তোমারে চায়।
অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী,
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জান মম মন তোমারে চায়।
ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তা'রে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়
তুমি জান, মন তোমারে চায়।
যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে,
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়
মনে মনে মন তোমারে চায়॥

১৫ই ভাদ্র, ১৩১৬

২৪

এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।
এই ত তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
প্রভাত আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ॥

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৬।

২৫

আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ সভায়
এইটুকু মোর স্থান।
আমি তোমার ভুবন মাঝে
লাগিনি নাথ কোনো কাজে,
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ।

নিশায় নীরব দেবালয়ে
তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো
গাইতে হে রাজন।
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে
বাজবে বীণা সোনার সুরে
আমি যেন না রই দূরে
এই দিয়ো মোর মান॥

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৬।

২৬

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও।
পাশে থেকে চিনতে নারি,
কোন্ দিকে যে কি নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী
হৃদয় পানে হাসিয়া চাও!
বল আমায় বল কথা
গায়ে আমার পরশ কর।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমায় তুমি তুলে ধর।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে কান্না মিছে
সাম্‌নে এসে এ ভুল ঘুচাও॥

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৬।

২৭

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে যে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাক,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাক,
নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখ
আলোকে ভরা উদার ত্রিভুবন॥

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৬।

২৮

আমার মিলন লাগি তুমি
আসচ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল সাঁঝে,
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

ওগো পথিক আজকে আমার
সকল পরাণ ব্যেপে,
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠচে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ,
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ,
তোমার গন্ধ মেখে॥

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৬

২৯

এস হে এস সজল ঘন,
 বাদল বরিষণে ;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
 এস হে এ জীবনে।

এস হে গিরিশিখর চুমি,
ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি ;
গগন ছেয়ে এস হে তুমি
 গভীর গরজনে।

ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন
 পুলকভরা ফুলে।
উছলি উঠে কল রোদন
 নদীর কূলে কূলে।

এস হে এস হৃদয়ভরা,
এস হে এস পিপাসাহরা,
এস হে আঁখি-শীতল-করা
 ঘনায়ে এস মনে॥

ভাদ্র, ১৩১৬।

———

৩০

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খসে' যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে ?

পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ-বীণায় কি সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রেরে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে।

পাগল করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন পানে
রয় না বাঁধা বন্ধেরে
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে' যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধেরে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে॥

১৮ই ভাদ্র, ১৩১৬।

৩১

নিশার স্বপন ছুটল রে, এই
ছুটল রে।
টুটল বাঁধন টুটল রে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎ পানে,
হৃদয়-শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুটল রে, এই
ফুটল রে।

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়ন-জলে ভেসে হৃদয়
চরণ-তলে লুটল রে।
আকাশ হ'তে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা-কারার দ্বারে আমার,
জয়ধ্বনি উঠল রে, এই
উঠল রে॥

১৮ই ভাদ্র, ১৩১৬।

৩২

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দ-গান গা রে হৃদয়
আনন্দ-গান গা রে।
নীল আকাশের নীরব কথা,
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে।

শস্যক্ষেতের সোনার গানে
যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ রে চেয়ে গভীর সুখে
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হ'য়ে যা রে॥

১৮ই ভাদ্র, ১৩১৬।

৩৩

হেথা　যে গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে গান গাওয়া।
আজো　কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।

আমার লাগে নাই সে সুর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফোটে নাই সে ফুল, শুধু
বহেছে এক হাওয়া।

আমি দেখি নাই তা'র মুখ, আমি
শুনি নাই তা'র বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সেজন
করে আসা-যাওয়া।

শুধু আসন পাতা হ'ল আমার
সারাটি দিন ধরে',
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তা'রে
ডাকব কেমন করে'।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তা'রে
হয়নি আমার পাওয়া॥

২৭শে ভাদ্র, ১৩১৬।

৩৪

যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে'
রইব কত আর।
আর পারিনে রাত জাগতে, হে নাথ,
ভাবতে অনিবার।

আছি রাত্রি দিবস ধরে'
দুয়ার আমার বন্ধ করে',
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার।

তাই ত কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।

তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখতে যা চাই রয় না তাও
ধূলায় একাকার॥

১লা আশ্বিন, ১৩১৬

৩৫

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার
আমার এই মলিন অহঙ্কার।
দিনের কাজে ধূলা লাগি'
অনেক দাগে হ'ল দাগী,
এমনি তপ্ত হ'য়ে আছে
সহ্য করা ভার
আমার এই মলিন অহঙ্কার।
এখন ত কাজ সাঙ্গ হ'ল
দিনের অবসানে,
হ'ল রে তাঁর আসার সময়
আশা এল প্রাণে।
স্নান করে' আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার
ওরে আয় সময় নেই যে আর॥

১৯শে আশ্বিন, ১৩১৬।

৩৬

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর।

আজিকে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে' মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর।

কেমন খেলা হ'ল আমার
আজি তোমার সনে,
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে।

আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন-জলে,
বিরহ আজ মধুর হ'য়ে
করেছে প্রাণ ভোর॥

২৫শে আশ্বিন, ১৩১৬।

৩৭

প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি।
এসেছি যে তোমায়, হে নাথ,
পরাতে রাখী।

যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে, কেহই
র'বে না বাকি।

আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে,
আমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।

তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি॥

২৭শে আশ্বিন, ১৩১৬।

৩৮

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হ'ল ধন্য হ'ল মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি।
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি?
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি'
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব
এ মোর নিবেদন॥

৩০শে আশ্বিন, ১৩১৬

৩৯

আলোয় আলোকময় করেহে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হ'তে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো।

তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত
বুলালো বুলালো॥

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।

৪০

আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে র'ব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হ'ব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো,
চিরজনম এমন করে' ভুলিয়োনাকো,
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হ'ব।
আমি তোমার যাত্রীদলের র'ব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছুই চাইব না ত রইব চেয়ে ;
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই ল'ব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হ'ব॥

১০ই পৌষ, ১৩১৬।

৪১

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হ'য়ে র'ব মরি।

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো
সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তা'র কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি॥

১২ই পৌষ, ১৩১৬।

৪২

আকাশ তলে উঠ্‌ল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপ্‌ড়িগুলি থরে থরে
ছড়াল দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে',
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।

আকাশেতে ঢেউ দিয়ে রে
বাতাস বহে' যায়।
চারদিকে গান বেজে ওঠে,
চারদিকে প্রাণ নাচে ছোটে,
গগনভরা পরশখানি
লাগে সকল গায়।
ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে',
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে' যায়।

দশদিকেতে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।
রয়েছে জীব যে যেখানে
সকলকে সে ডেকে আনে,
সবার হাতে সবার পাতে
অন্ন সে দেয় বাঁটি।
ভরেছে মন গীতে গন্ধে,
বসে' আছি মহানন্দে,
আমায় ঘিরে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি

আলো, তোমায় নমি, আমার
মিলাক্ অপরাধ।
ললাটেতে রাখ আমার
পিতার আশীর্ব্বাদ।
বাতাস, তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ,
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্ব্বাদ।
মাটি, তোমায় নমি, আমার
মিটুক সর্ব্বসাধ।
গৃহ ভরে' ফলিয়ে তোলো
পিতার আশীর্ব্বাদ॥

পৌষ, ১৩১৬।

৪৩

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই
মনের মত করে'।
গান গেয়ে আনন্দ মনে
ঝাঁটিয়ে দে সব ধূলা।
যত্ন করে' দূর করে' দে
আবর্জ্জনাগুলা।
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ
সাজিখানি ভরে'—
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই
মনের মত করে'।

দিন রজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠে
নয়ন মেলে' চাই
খুসি হ'য়ে আছেন চেয়ে
দেখ্‌তে মোরা পাই।

তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।

একলা তিনি বসে' থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অন্য কোথাও
চলি কাজের তরে।
দ্বারের কাছে তিনি মোদের
এগিয়ে দিয়ে যান ;—
মনের সুখে ধাই রে পথে,
আনন্দে গাই গান।
দিনের শেষে ফিরি যখন
নানা কাজের পরে
দেখি তিনি একলা বসে'
আমাদের এই ঘরে।

তিনি জেগে বসে' থাকেন
আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অচেতনে
ঘুমাই শয্যাপরে।

জগতে কেউ দেখ্‌তে না পায়
লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে'
জ্বালান সারা রাতি।
ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই
আনাগোনা করে,
অন্ধকারে হাসেন তিনি
আমাদের এই ঘরে ॥

পৌষ, ১৩১৬।

৪৪

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত সেথায়, খোল দ্বার,
আজ ল'ব তাঁর দেখা।
সারা দিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয় নি আমার শেখা।

তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজা-লোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা॥

১৭ই পৌষ, ১৩১৬।

৪৫

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো
পাগল ওগো ধরায় আস।
এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে'
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস॥

১৭ই পৌষ, ১৩১৬।

৪৬

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।
আমায় দাও সুধাময় সুর,
আমার বাণী কর সুমধুর,
আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি
বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।
এই নিখিল আকাশ ধরা
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হ'তে এই কথাটি
বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।
দুখী জেনেই কাছে আস,
ছোট বলে'ই ভালবাস,
আমার ছোট মুখে এই কথাটি
বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও॥

মাঘ, ১৩১৬।

গীতাঞ্জলি

৪৭

নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়নজলে।

একা আমি অহঙ্কারের
উচ্চ অচলে,
পাষাণ আসন ধূলায় লুটাও
ভাঙ সবলে।
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে।

কি ল'য়ে বা গর্ব্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।

দিনের কর্ম্ম ডুবেছে মোর
আপন অতলে
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন
যায় না বিফলে।
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে॥

মাঘ, ১৩১৬।

৪৮

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে ?
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর মাঝে
এ কি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে ॥

ওগো জানি না কি নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল সৌগন্ধ্যে,
নব- পল্লব-মর্ম্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে ॥

ফাল্গুন, ১৩১৬।

———

৪৯

তব সিংহাসনের আসন হ'তে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

একলা বসে' আপন মনে
গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর
এলে তুমি নেমে,—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

তোমার সভায় কত না গান
কতই আছেন গুণী ;
গুণহীনের গানখানি আজ
বাজ্‌ল তোমার প্রেমে।

লাগ্‌ল বিশ্ব তানের মাঝে
একটি করুণ সুর,
হাতে ল'য়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে॥

২৭শে চৈত্র, ১৩১৬।

৫০

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ, লহ।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।
যে দিন গেছে তোমা বিনা
তা'রে আর ফিরে চাহি না,
যাক্ সে ধূলাতে!
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ॥
কি আবেশে, কিসের কথায়
ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে
তোমার আপন বাণী কহ॥
কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তা'র লাগি আর ফিরায়ো না,
তা'রে আগুন দিয়ে দহ॥

২৮শে চৈত্র, ১৩১৬।

———

৫১

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো

কর্ম্ম যখন প্রবল আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ
শান্ত চরণে এসো।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে' থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ,
রাজ-সমারোহে এসো।

বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো॥

২৮শে চৈত্র, ১৩১৬।

৫২

এবার   নীরব করে' দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
তা'র   হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।

নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাও হে পূরে,
যে তান দিয়ে অবাক কর
গ্রহ শশীরে।

যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন মরণে
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে।

বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে' শুন্‌ব বাঁশি
অকূল তিমিরে॥

৩০শে চৈত্র, ১৩১৬।

৫৩

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার ;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তা'র।

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পূরে
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল স্বরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি নারে
হৃদয়-ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার॥

৪ঠা বৈশাখ, ১৩১৭।

৫৪

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী!
এসেছিল নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।

জেগে দেখি দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তা'র মালার পরশ
বুকে লাগে নি॥

১২ই বৈশাখ, ১৩১৭।

৫৫

তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তা'র পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
সকল সুরে বেজেছে তা'র
আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে॥

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৫৬

মেনেছি, হার মেনেছি।
ঠেল্‌তে গেছি তোমায় যত
আমায় তত হেনেছি।

আমার চিত্তগগন থেকে
তোমায় কেউ যে রাখ্‌বে ঢেকে,
কোনোমতেই সইবে না সে
বারেবারেই জেনেছি।

অতীত জীবন ছায়ার মত
চল্‌চে পিছে পিছে,
কত মায়ার বাঁশির সুরে
ডাক্‌চে আমায় মিছে।

মিল ছুটেছে তাহার সাথে,
ধরা দিলেম তোমার হাতে,
যা আছে মোর এই জীবনে
তোমার দ্বারে এনেছি॥

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

৫৭

একটি একটি করে' তোমার
পুরানো তার খোলো,
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো।
ভেঙে গেছে দিনের মেলা,
বস্‌বে সভা সন্ধ্যা বেলা,
শেষের সুর যে বাজাবে তা'র
আসার সময় হোলো—
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো॥

দুয়ার তোমার খুলে দাও রে
আঁধার আকাশ পরে,
সপ্ত লোকের নীরবতা
আসুক তোমার ঘরে।
এতদিন যে গেয়েছ গান
আজকে তারি হোক্ অবসান,
এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র
সেই কথাটাই ভোলো।
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো॥

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

৫৮

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে ত   আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসচি তোমায় চেয়ে
সে ত   আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়
তেমনি করে' ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে ত   আজকে নয় সে আজকে নয়।
কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তা'র
ঠিকানা না পেয়ে—
সে ত   আজকে নয় সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেম্‌নি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে চেয়ে—
সে ত   আজকে নয় সে আজকে নয়॥

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

———

৫৯

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে' রেখেছ নাথ
অনেক ব্যবধান—
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া
ধনজনমান।
আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা
ঘুচায়ে দাও তা'র।

না রাখ তা'র ঘরের আড়াল,
না রাখ তা'র ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন।
না থাকে তা'র মান অপমান,
লজ্জা সরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তা'র
বিশ্ব ভুবনময়।
এমন করে' মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে' রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে, তা'র
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে চাই॥

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬০

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে,
অরুণ বরণ পারিজাত ল'য়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি' গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে,
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কি আনন্দে,
ধূলায় লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কি আঘাতে।

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে'
দেখা বুঝি আর হ'ল না তোমার সাথে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬১

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে,
তখন কে তুমি তা কে জান্‌ত !
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে,
জীবন বহে' যেত অশান্ত ।

তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত,
যেন আমার আপন সখার মত,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত ।

ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জান্‌ত !
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত ।

হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণপানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

৬২

ঐরে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে!
সাম্‌নে যখন যাবি ওরে
থাক্ না পিছন পিছে পড়ে',
পিঠে তা'রে বইতে গেলি,
একলা পড়ে' রইলি কূলে

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হ'ল গেলি ভুলে।
ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,
জীবনখানি উজাড় করে'
সঁপে দে তা'র চরণ-মূলে॥

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬৩

চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজুলি তা'র বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কি মহা তানে!

পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়াল রে অঙ্গ আমার
ছড়াল প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি
হ'ল আমার সাথের সাথী,
অট্টহাসে ধায় কোথা সে
বারণ না মানে॥

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬৪

ওগো মৌন, না যদি কও
নাই কহিলে কথা।
বক্ষ ভরি বইব আমি
তোমার নীরবতা।
স্তব্ধ হ'য়ে রইব পড়ে,'
রজনী রয় যেমন করে'
জ্বালিয়ে তারা নিমেষ-হারা,
ধৈর্য্যে অবনতা।

হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে।
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।
তখন আমার পাখীর বাসায়
জাগ্‌বে কি গান তোমার ভাষায়?
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা?

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬৫

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব
কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে
লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তা'র আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া
ভাঙা মন্দির-দ্বারে॥

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬৬

সবা হ'তে রাখ্‌ব তোমায়
　　আড়াল করে'
হেন পূজার ঘর কোথা পাই
　　আমার ঘরে ?
　　　　যদি আমার দিনে রাতে,
　　　　যদি আমার সবার সাথে
　　　　দয়া করে' দাও ধরা, ত
　　　　　　রাখ্‌ব ধরে'।

মান দিব যে তেমন মানী
　　নই ত আমি,
পূজা করি সে আয়োজন
　　নাই ত স্বামী।
　　　　যদি তোমায় ভালবাসি,
　　　　আপনি বেজে উঠ্‌বে বাঁশি,
　　　　আপনি ফুটে উঠ্‌বে কুসুম
　　　　　　কানন ভরে'॥

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬৭

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগ্‌ব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,—
সেই প্রাণে মন উঠ্‌বে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত-বীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন করে'
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্॥

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬৮

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে ?
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই
পায়ে থুতে।

এতদিন ত ছিল না মোর
কোনো ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ো না গো দিয়ো না আর
ধূলায় শুতে॥

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৬৯

সভা যখন ভাঙবে তখন
শেষের গান কি যাব গেয়ে ?
হয় ত তখন কণ্ঠহারা
মুখের পানে র'ব চেয়ে।
এখনো যে স্থর লাগে নি
বাজ্‌বে কি আর সেই রাগিণী,
প্রেমের ব্যথা সোনার তানে
সন্ধ্যাগগন ফেল্‌বে ছেয়ে ?

এতদিন যে সেধেছি স্থর
দিনেরাতে আপন মনে
ভাগ্যে যদি সেই সাধনা
সমাপ্ত হয় এই জীবনে—
এ জনমের পূর্ণ বাণী
মানস-বনের পদ্মখানি
ভাসাব শেষ সাগরপানে
বিশ্বগানের ধারা বেয়ে ॥

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৭০

চিরজনমের বেদনা,
ওহে চিরজীবনের সাধনা।
তোমার আগুন উঠুক্ হে জ্বলে',
কৃপা করিয়ো না দুর্ব্বল বলে',
যত তাপ পাই সহিবারে চাই,
পুড়ে হোক্ ছাই বাসনা।
অমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও
আর দেরি কেন মিছে?
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে পড়ে' যাক্ পিছে।
গরজি' গরজি' শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক্ এবার
গর্ব্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক্ তীব্র চেতনা॥

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৭১

তুমি যখন গান গাহিতে বল
　　　গর্ব্ব আমার ভরে' উঠে বুকে ;
দুই আঁখি মোর করে ছলছল,
　　　নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম
　　　উড়িতে চায় পাখীর মত সুখে।

তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে,
ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে,
জানি আমি এই গানেরি বলে
　　　বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
　　　বন্ধু বলে' ডাকি মোর প্রভুকে॥

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৭২

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।
চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে
সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে
যত বাঁধা সব টুটে যায় যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি,
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে'
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
এ জীবনে যা কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক্ সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে॥

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

৭৩

তা'রা দিনের বেলা এসেছিল
আমার ঘরে,—
বলেছিল একটি পাশে
রইব পড়ে'।
বলেছিল, দেবতা সেবায়
আমরা হব তোমার সহায়—
যা কিছু পাই প্রসাদ ল'ব
পূজার পরে।

এমনি করে' দরিদ্র ক্ষীণ
মলিন বেশে
সঙ্কোচেতে একটি কোণে
রৈল এসে।
রাতে দেখি প্রবল হ'য়ে
পশে আমার দেবালয়ে,
মলিন হাতে পূজার বলি
হরণ করে॥

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

৭৪

তা'রা তোমার নামে বাটের মাঝে
মাশুল লয় যে ধরি।
দেখি শেষে ঘাটে এসে
নাইক পারের কড়ি।
তা'রা তোমার কাজের ভাণে
নাশ করে গো ধনে প্রাণে,
সামান্য যা আছে আমার
লয় তা অপহরি।
আজকে আমি চিনেছি সেই
ছদ্মবেশীদলে।
তা'রাও আমায় চিনেছে হায়
শক্তিবিহীন বলে'।
গোপন মূর্ত্তি ছেড়েছে তাই,
লজ্জাসরম আর কিছু নাই,
দাঁড়িয়েছে আজ মাথা তুলে
পথ অবরোধ করি'॥

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৫

এই জ্যোৎস্না রাতে জাগে আমার প্রাণ ;
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান ?
দেখ্‌তে পাব অপূর্ব্ব সেই মুখ,
রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে
ফিরবে আমার অশ্রুভরা গান ?

সাহস করে' তোমার পদমূলে
আপ্‌নারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
পড়ে' আছি মাটিতে মুখ রেখে,
ফিরিয়ে পাছে দাও এ আমার দান।
আপ্‌নি যদি আমার হাতে ধরে'
কাছে এসে উঠ্‌তে বল মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা
এই নিমিষেই হবে অবসান ॥

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

৭৬

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে ;
ত্রিভুবনে জান্‌বে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় চল্‌ব মোরা কোন্ মুখে কোন্ দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্রমাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন হারা
আমার সেই রাগিণী শুন্‌বে নীরব হেসে।

আজো সময় হয়নি কি তা'র কাজ কি আছে বাকি ?
ওগো ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখী
আপন কুলায় মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আস্‌বে ঘাটের পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে ?
অস্তরবির শেষ আলোটির মত
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে॥

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

৭৭

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হ'তে
পারব কবে ?
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হ'তে
পারব কবে !

নিখিল-আশা-আকাঙ্ক্ষাময়
দুঃখে সুখে,
ঝাঁপ দিয়ে তা'র তরঙ্গপাত
ধরব বুকে।
মন্দভালোর আঘাত-বেগে
তোমার বুকে উঠ্‌বে জেগে,
শুন্‌ব বাণী বিশ্বজনের
কলরবে।
প্রাণের রথে বাহির হ'তে
পারব কবে?

১লা আষাঢ় ১৩১৭।

৭৮

একা আমি ফিরব না আর
এমন করে'—
নিজের মনে কোণে কোণে
মোহের ঘোরে।
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে
ছোট করে' ঘিরতে গিয়ে
আপ্‌নাকে যে বাঁধি কেবল
আপন ডোরে।

যখন আমি পাব তোমায়
নিখিল মাঝে
সেইখনে হৃদয়ে পাব
হৃদয়-রাজে!
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল,
তারি পরে বিশ্বকমল;
তারি পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে॥

২রা আষাঢ়, ১৩১৭।

৭৯

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, কর
করুণ আঁখিপাত।

নিবিড় বন-শাখার পরে
আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদলভরা আলস ভরে
ঘুমায়ে আছে রাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, কর
করুণ আঁখিপাত।

বিরামহীন বিজুলিঘাতে
নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা জলধারার সাথে
গাহিতে চাহে গান।

হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হ'ল তিমিরতলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুলবলে
বাড়ায়ে দুই হাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, কর
করুণ আঁখিপাত॥

৩রা আষাঢ়, ১৩১৭।

৮০

ছিন্ন করে' লও হে মোরে
      আর বিলম্ব নয়।
ধূলায় পাছে ঝরে' পড়ি
      এই জাগে মোর ভয়।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি, জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি তা'র
      ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন কর ছিন্ন কর
      আর বিলম্ব নয়।

কখন্ যে দিন ফুরিয়ে যাবে,
আস্‌বে আঁধার করে’,
কখন্ তোমার পূজার বেলা
কাটবে অগোচরে।
যেটুকু এর রং ধরেছে,
গন্ধে সুধায় বুক ভরেছে,
তোমার সেবায় লও সেটুকু
থাক্‌তে সুসময়।
ছিন্ন কর ছিন্ন কর
আর বিলম্ব নয়॥

৩রা আষাঢ়, ১৩১৭।

৮১

চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে
বল্‌তে যেন পাই।
আর যা কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেম্‌নি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে,
তেম্‌নি তোমায় আঘাত করি
তবু তোমায় চাই॥

৩রা আষাঢ়, ১৩১৭

৮২

আমার এ প্রেম নয় ত ভীরু,
নয় ত হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হ'য়ে
ফেল্‌বে অশ্রুজল ?
মন্দমধুর সুখে শোভায়
প্রেমকে কেন ঘুমে ডোবায় ?
তোমার সাথে জাগ্‌তে সে চায়
আনন্দে পাগল।

নাচো যখন ভীষণ সাজে
তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহবিহ্বল।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক্ সে রসাতল॥

৪ঠা আষাঢ়, ১৩১৭

৮৩

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।
আরো কঠিন স্বরে জীবনতারে ঝঙ্কারো।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে
বাজে নি তা চরমতানে,
নিঠুর মূর্চ্ছনায় সে গানে
মূর্ত্তি সঞ্চারো।

লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু স্বরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ কোরো না।
জ্বলে' উঠুক্ সকল হুতাশ
গর্জ্জি উঠুক্ সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো॥

৪ঠা আষাঢ় ১৩১৭।

৮৪

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো !
এম্‌নি করে' হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার।

অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে'
আমার যত কালো ॥

৪ঠা আষাঢ়, ১৩১৭।

৮৫

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করিনে।
পিতা বলে' প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে' দু-হাত ধরিনে।

আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হ'য়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরি,
সঙ্গী বলে' তোমায় ধরিনে।

ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে' মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরিনে।

ছুটে এসে সবার সুখে দুখে,
দাঁড়াইনে ত তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে॥

৫ই আষাঢ়, ১৩১৭।

৮৬

তুমি যে কাজ করচ, আমায়
সেই কাজে কি লাগাবে না ?
কাজের দিনে আমায় তুমি
আপন হাতে জাগাবে না ?
ভালোমন্দ ওঠাপড়ায়,
বিশ্বশালার ভাঙাগড়ায়
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন
তোমার সাথে হয় গো চেনা।

ভেবেছিলেম বিজন ছায়ায়
নাই যেখানে আনাগোনা
সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায়
সেথায় হবে জানাশোনা।
অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চল্‌চে যেথায় বেচাকেনা॥

৬ই আষাঢ়, ১৩১৭।

৮৭

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো ;
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো ॥

৭ই আষাঢ়, ১৩১৭।

৮৮

ডাক ডাক ডাক আমারে,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল গভীর
পবিত্র আঁধারে।
তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি
দিতেছে জীবন ধূলাতে টানি,
সারাক্ষণের বাক্যমনের
সহস্র বিকারে।

মুক্ত কর হে মুক্ত কর আমারে,
তোমার নিবিড় নীরব উদার
অনন্ত আঁধারে।
নীরব রাত্রে হারাইয়া বাক্
বাহির আমার বাহিরে মিশাক্,
দেখা দিক্ মম অন্তরতম
অখণ্ড আকারে॥

৭ই আষাঢ়, ১৩১৭

৮৯

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।
সোনার ঘটে সূর্য্য তারা
নিচ্চে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।

যেথায় তুমি বস' দানের আসনে,
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নূতন রসে ঢেলে
আপ্‌নাকে যে দিচ্চ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে ?
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে॥

৮ই আষাঢ়, ১৩১৭

৯০

ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ এই ত তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তা'রে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া করে' প্রভু রাখ মোর অভিমান।

তা'র পরে যদি পূজার বেলার শেষে
এ গান ঝরিয়া ধরার ধূলায় মেশে,
তবে ক্ষতি কিছু নাই,—তব করতলপুটে
অজস্রধন কত লুটে কত টুটে,
তা'রা আমার জীবনে ক্ষণকাল তরে ফুটে,
চিরকাল তরে সার্থক করে প্রাণ॥

৯ই আষাঢ়, ১৩১৭।

৯১

মুখ ফিরায়ে র'ব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল কর প্রাণে।
কেবল থাকা কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে।

নানা ইচ্ছা ধায় নানা দিক পানে,
একটি ইচ্ছা সফল কর প্রাণে।
সেই ইচ্ছাটি রাতের পরে রাতে
জাগে যেন একের বেদনাতে,
দিনের পরে দিনকে যেন গাঁথে
একের সূত্রে এক আনন্দগানে॥

১০ই আষাঢ়, ১৩১৭

৯২

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি,
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে
আবার এসেছে আষাঢ় অকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
"এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ,
"এসেছে, এসেছে" উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে॥

১০ই আষাঢ়, ১৩১৭।

গীতাঞ্জলি

৯৩

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ;
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে' চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে দূরে সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।
জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তা'র ঘন ঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

ঈশান কোণেতে ঐ যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কি করিছে কানাকানি।
দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠেছে কোন্ আসন্ন কাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে॥

আষাঢ়, ১৩১৭।

৯৪

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি,
শুনিয়া লইতে চাহে আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান !

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ॥

১৩ই আষাঢ়, ১৩১৭

৯৫

এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে
তব আনন্দ মহাসঙ্গীতে বাজে।
তোমার আকাশ, উদার আলোকধারা,
দ্বার ছোট দেখে' ফেরে না যেন গো তা'রা
ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তর মোর নিত্য নূতন সাজে।

তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে
বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে।
তব আনন্দ পরম দুঃখে মম
জ্বলে' উঠে যেন পুণ্য আলোকসম,
তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি
ফুটে ওঠে ফেটে আমার সকল কাজে॥

১৩ই আষাঢ়, ১৩১৭।

৯৬

একলা আমি বাহির হলেম
তোমার অভিসারে,
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে ?
ছাড়াতে চাই অনেক করে'
ঘুরে চলি' যাই যে সরে'
মনে করি আপদ গেছে,—
আবার দেখি তা'রে।

ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে,
বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায়
কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি, প্রভু,
লজ্জা তাহার নাই যে কভু,
তা'রে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাব তোমার দ্বারে॥

১৪ই আষাঢ়, ১৩১৭।

৯৭

আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু,
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে,
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে।

যেথা বাহিরের আবরণ নাহি রয়,
যেথা আপনার উলঙ্গ পরিচয়।
আমার বলিয়া কিছু নাই একেবারে,
এ সত্য যেথা নাহি ঢাকে আপনারে,
সেথায় দাঁড়ায়ে নিলাজ দৈন্য মম
ভরিয়া লইব তাঁহার পরম দানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে॥

১৫ই আষাঢ়, ১৩১৭।

৯৮

আর   আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।
আর   নিজের দ্বারে কাঙাল হ'য়ে
রইব না।
এই   বোঝা তোমার পায়ে ফেলে
বেরিয়ে পড়ব অবহেলে,
কোনো খবর রাখব না ওর
কোনো কথাই কইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।

বাসনা মোর যারেই পরশ
করে সে,
আলোটি তা'র নিবিয়ে ফেলে
নিমেষে।
ওরে সেই অশুচি, দুই হাতে তা'র
যা এনেছে চাইনে সে আর,
তোমার প্রেমে বাজ্‌বে না যা
সে আর আমি সইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না॥

১৫ই আষাঢ়, ১৩১৭

৯৯

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগ রে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'ল হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন ॥
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

রণধারা বাহি, জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি-পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর ।

হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন কর মোর মন,
শোন রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় কর কর জয়
অপমান দূরে যাক্।
দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ!
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।

এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

১৮ই আষাঢ়, ১৩১৭।

১০০

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহঙ্কার ত পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের'
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
সঙ্গী হ'য়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে॥

১৯শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১০১

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান ॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে'
ভাগ করে' খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান ॥

তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে
ধূলায় সে যায় ব'য়ে
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হ'তে হ'বে আজি তোরে সবার সমান ॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধরে' নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হ'তে হ'বে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হ'বে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

২০শে আষাঢ় ১৩১৭

১০২

ছাড়িস্‌নে, ধরে' থাক্ এঁটে,
ওরে হ'বে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে,
ওরে আর নেই ভয়।
ওই দেখ পূর্ব্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়।
ওরে আর নেই ভয়।

এরা যে কেবল নিশাচর—
অবিশ্বাস আপনার পর,
নিরাশ্বাস, আলস্য সংশয়,
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আয়, আয় রে বাহিরে
চেয়ে দেখ্, দেখ্ ঊর্দ্ধশিরে,
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ম্ময়
ওরে আর নেই ভয়॥

২১শে আষাঢ়, ১৩১৭

১০৩

আছে আমার হৃদয় আছে ভরে'
এখন তুমি যা খুসি তাই কর।
এম্‌নি যদি বিরাজ অন্তরে
বাহির হ'তে সকলি মোর হর।
সব পিপাসার যেথায় অবসান
সেথায় যদি পূর্ণ কর প্রাণ,
তাহার পরে মরুপথের মাঝে
উঠে রৌদ্র উঠুক্ খরতর।

এই যে খেলা খেল্‌চ কত ছলে
এই খেলা ত আমি ভালবাসি।
একদিকেতে ভাসাও আঁখিজলে
আরেক দিকে জাগিয়ে তোল হাসি।
যখন ভাবি সব খোয়ালেম বুঝি,
গভীর করে' পাই তাহারে খুঁজি,
কোলের থেকে যখন ফেল দূরে
বুকের মাঝে আবার তুলে ধর॥

২১শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১০৪

গর্ব্ব করে' নিইনে ও নাম, জান অন্তর্যামী,
আমার মুখে তোমার নাম কি সাজে ?
যখন সবাই উপহাসে তখন ভাবি আমি
আমার কণ্ঠে তোমার গান কি বাজে ?
তোমা হ'তে অনেক দূরে থাকি
সে যেন মোর জান্‌তে না রয় বাকি,
নামগানের এই ছদ্মবেশে দিই পরিচয় পাছে
মনে মনে মরি যে সেই লাজে।

অহঙ্কারের মিথ্যা হ'তে বাঁচাও দয়া করে'
রাখ আমায় যেথা আমার স্থান।
আর সকলের দৃষ্টি হ'তে সরিয়ে দিয়ে মোরে
কর তোমার নত নয়ন দান।
আমার পূজা দয়া পাবার তরে,
মান যেন সে না পায় কারো ঘরে,
নিত্য তোমায় ডাকি আমি ধূলার পরে বসে'
নিত্যনূতন অপরাধের মাঝে ॥

২২শে আষাঢ়, ১৩১৭

১০৫

কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে—
জীবনে তুই যা নিয়েছিস্
মরণে সব নিতে হবে।
এই ভরা ভাণ্ডারে এসে
শূন্য কি তুই যাবি শেষে ?
নেবার মত যা আছে তোর
ভালো করে' নে তুই তবে

আবর্জ্জনার অনেক বোঝা
জমিয়েছিস্ যে নিরবধি,—
বেঁচে যাবি, যাবার বেলা
ক্ষয় করে' সব যাস্ রে যদি।
এসেছি এই পৃথিবীতে,
হেথায় হবে সেজে নিতে
রাজার বেশে চল্ রে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে॥

২৩শে আষাঢ় ১৩১৭।

১০৬

নদীপারের এই আষাঢ়ের
প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।
সবুজ নীলে সোনায় মিলে
যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে
গভীর বাণী—
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

এমনি করে' চল্‌তে পথে
ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব
নিস্‌ রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস্‌ দিবস রাতে,
প্রতিদিনটি যতন করে'
ভাগ্য মানি,
নেরে, ও মন, নেরে আপন
প্রাণে টানি॥

২৫শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১০৭

মরণ যেদিন দিনের শেষে আস্‌বে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে?
ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তা'র দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না ত উহারে—
মরণ যেদিন আস্‌বে আমার দুয়ারে।
কত শরৎ বসন্তরাত,
কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত
জীবনপাত্রে কত যে রস বরষে;
কতই ফলে কতই ফুলে
হৃদয় আমার ভরি তুলে
দুঃখ সুখের আলো ছায়ার পরশে।
যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এত দিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে
মরণ যেদিন আস্‌বে আমার দুয়ারে॥

২৫শে আষাঢ়, ১৩১৭

১০৮

দয়া করে' ইচ্ছা করে' আপ্‌নি ছোট হ'য়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য্যসুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা
কত আকার ল'য়ে।
বন্ধু হ'য়ে পিতা হ'য়ে জননী হ'য়ে
আপ্‌নি তুমি ছোট হ'য়ে এস হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে
করব ছোট বিশ্বনাথে ?
জানাব আর জান্‌ব তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?

২৬শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১০৯

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
সারাজনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে' বেড়াই
দুঃখসুখের ব্যথা ;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

যা পেয়েছি, যা হয়েছি,
যা কিছু মোর আশা
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আস্‌বে বরের সাজে।
সেদিন আমার র'বে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিল্‌বে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা॥

২৬শে আষাঢ় ১৩১৭।

১১০

যাত্রী আমি ওরে।
পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধরে'।
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে,
ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে'।

যাত্রী আমি ওরে।
চল্‌তে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে'।
দেহ-দুর্গে খুল্‌বে সকল দ্বার,
ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালো মন্দ কাটিয়ে হ'ব পার
চল্‌তে র'ব লোকে লোকান্তরে।

যাত্রী আমি ওরে।
যা কিছু ভার যাবে সকল সরে’।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে।

যাত্রী আমি ওরে—
বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায়নি কোনো পাখী,
কি জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি
জেগে ছিল অন্ধকারের পারে।

যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দুনয়নে,
অনাদিকাল চাহে আমার তরে॥

২৬শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১১১

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে।
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে' গিয়ে
ঠাঁই করে' তুই নেরে কোনোমতে।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ,
সে সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে।

ঐ যে চাকা ঘুরচে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুন্‌চ কি সেই ধ্বনি ?
রক্তে তোমার দুল্‌চে না কি প্রাণ ?
গাইচে না মন মরণজয়ী গান ?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মত
ছুট্‌চে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ?

২৬শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১১২

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে’।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে ?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটী ভেঙে
করচে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ,
খাট্‌চে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয় রে ধূলার পরে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপ্‌নি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে'
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক্ ধূলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে'॥

২৭শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১১৩

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে,—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর॥

২৭শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১১৪

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চল্‌চে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে'
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফিরচ কত মনোহরণ-বেশে,
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

তাই ত, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥

২৮শে আষাঢ়, ১৩১৭

১১৫

মানের আসন, আরাম শয়ন
নয় ত তোমার তরে।
সব ছেড়ে আজ খুসি হ'য়ে
চল পথের পরে।
এস বন্ধু তোমরা সবে
এক সাথে সব বাহির হবে,
আজকে যাত্রা করব মোরা
অমানিতের ঘরে।

নিন্দা পরব ভূষণ করে'
কাঁটার কণ্ঠহার,
মাথায় করে' তুলে ল'ব
অপমানের ভার।
দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধূলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্যপাত্রটি নিই
আনন্দরস ভরে'॥

২৯শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১১৬

প্রভুগৃহ হ'তে আসিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো
বিপুল বল।
কোথায় বর্ম্ম, অস্ত্র কোথায়,
ক্ষীণ দরিদ্র অতি অসহায়,
চারিদিক হ'তে এসেছে আঘাত
অনর্গল,
প্রভুগৃহ হ'তে আসিলে যেদিন
বীরের দল।

প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় লুকালো আবার
বিপুল বল।
ধনুশর অসি কোথা গেল খসি,
শান্তির হাসি উঠিল বিকশি ;
চলে' গেলে রাখি সারা জীবনের
সকল ফল,
প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল ॥

৩১শে আষাঢ়, ১৩১৭।

১১৭

ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।
নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ,
পাথেয় যা ছিল ফুরিয়েছে বুঝি আজ,
যেতে হবে সরে' নীরব অন্তরালে
জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।
কি নিরখি আজি, এ কি অফুরান লীলা,
এ কি নবীনতা বহে অন্তঃশীলা!
পুরাতন ভাষা মরে' এল যবে মুখে,
নবগান হ'য়ে গুমরি উঠিল বুকে,
পুরাতন পথ শেষ হ'য়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে॥

৩১শে আষাঢ়, ১৩১৭

১১৮

আমার এ গান ছেড়েছে তা'র
সকল অলঙ্কার ;
তোমার কাছে রাখেনি আর
সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে',
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তা'র
মুখর ঝঙ্কার।

তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন ল'য়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তা'র ॥

১লা শ্রাবণ, ১৩১৭।

১১৯

নিন্দা দুঃখে অপমানে
যত আঘাত খাই
তবু জানি কিছুই সেথা
হারাবার ত নাই।
থাকি যখন ধূলার পরে
ভাব্‌তে না হয় আসনতরে,
দৈন্যমাঝে অসঙ্কোচে
প্রসাদ তব চাই।

লোকে যখন ভালো বলে,
যখন সুখে থাকি,
জানি মনে তাহার মাঝে
অনেক আছে ফাঁকি।
সেই ফাঁকিরে সাজিয়ে ল'য়ে
ঘুরে বেড়াই মাথায় ব'য়ে,
তোমার কাছে যাব, এমন
সময় নাহি পাই॥

২রা শ্রাবণ, ১৩১৭

১২০

রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার,—
খেলাধূলা আনন্দ তা'র সকলি যায় ঘুরে,
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।
ছেঁড়ে পাছে আঘাত লাগি',
পাছে ধূলায় হয় সে দাগী,
আপ্‌নাকে তাই সরিয়ে রাখে সবার হ'তে দূরে,
চল্‌তে গেলে ভাবনা ধরে তা'র,—
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন-হার।

কি হবে মা অমনতর রাজার মত সাজে,
কি হবে ঐ মণিরতন-হারে।
দুয়ার খুলে দাও যদি ত ছুটি পথের মাঝে
রৌদ্র বায়ু ধূলা কাদার পাড়ে।
যেথায় বিশ্বজনের মেলা,
সমস্ত দিন নানান্ খেলা,
চারিদিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,
সেথায় সে যে পায় না অধিকার,—
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন-হার॥

২রা শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২১

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা

দুটা তারে

জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই

বাজে নারে।

এই বেসুরো জটিলতায়

পরাণ আমার মরে ব্যথায়,

হঠাৎ আমার গান থেমে যায়

বারে বারে।

জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর

বাজে নারে।

এই বেদনা বইতে আমি
পারি না যে,
তোমার সভার পথে এসে
মরি লাজে।
তোমার যারা গুণী আছে
বস্‌তে নারি তাদের কাছে,
দাঁড়িয়ে থাকি সবার পাছে
বাহির দ্বারে।
জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর
বাজে নারে॥

৩রা শ্রাবণ, ১৩১৭

১২২

গাবার মত হয়নি কোনো গান,
দেবার মত হয়নি কিছু দান।
মনে যে হয় সবি রইল বাকি,
তোমায় শুধু দিয়ে এলেম ফাঁকি,
কবে হবে জীবন পূর্ণ করে'
এই জীবনের পূজা অবসান।

আর সকলের সেবা করি যত
প্রাণপণে দিই অর্ঘ্য ভরি ভরি।
সত্য মিথ্যা সাজিয়ে দিই যে কত
দীন বলিয়া পাছে ধরা পড়ি।
তোমার কাছে গোপন কিছু নাই,
তোমার পূজায় সাহস এত তাই,
যা আছে তাই পায়ের কাছে আনি
অনাবৃত দরিদ্র এই প্রাণ॥

৭ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২৩

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বারে,
ঘুচে যাবে সকল অহঙ্কার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না র'বে।

মরে' গিয়ে বাঁচ্‌ব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না র'বে॥

৭ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২৪

দুঃস্বপন কোথা হ'তে এসে
জীবনে বাধায় গণ্ডগোল।
কেঁদে উঠে জেগে দেখি শেষে
কিছু নাই আছে মার কোল।
ভেবেছিনু আর কেহ বুঝি,
ভয়ে তাই প্রাণপণে যুঝি,
তব হাসি দেখে আজ বুঝি
তুমিই দিয়েছ মোরে দোল।

এ জীবন সদা দেয় নাড়া
ল'য়ে তা'র সুখদুখ ভয়;
কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া,
সেই যেন মোর সমুদয়।
এ ঘোর কাটিয়ে যাবে চোখে
নিমেষেই প্রভাত-আলোকে,
পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে
থেমে যাবে সকল কল্লোল॥

৮ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২৫

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।

কত শেখা সেই শেখালো,
কত গোপন পথ দেখালো,
চিনিয়ে দিল কত তারা
হৃদ্‌গগনে।
বিচিত্র সুখদুখের দেশে
রহস্যলোক্‌ ঘুরিয়ে শেষে
সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে এল
কোন্‌ ভবনে॥

৯ই শ্রাবণ, ১৩১৭

১২৬

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে' যাব নবজীবনলোকে,
নূতন দেখা জাগ্‌বে আমার চোখে,
নবীন হ'য়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন-ডোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই,
বারে বারে নূতন লীলা তাই।
আবার তুমি জানিনে কোন্ বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ হেসে,
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে,
লাগ্‌বে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর॥

১০ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২৭

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে,—
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে।
অধীর হ'য়ে তরুলতায় ঘাসে,
যে আনন্দে দুই পাগলের মত
জীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্ট হাসে।
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখি-জলে
দুঃখব্যথার রক্ত শতদলে,
যা আছে সব ধূলায় ফেলে দিয়ে
যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে॥

১১ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২৮

যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে,
মনে করি আর পাব না ছাড়া।
যখন আমায় ফেল তুমি নীচে
মনে করি আর হব না খাড়া।
আবার তুমি দাও যে বাঁধন খুলে,
আবার তুমি নাও আমারে তুলে,
চিরজীবন বাহুদোলায় তব
এম্‌নি করে' কেবলি দাও নাড়া।

ভয় লাগায়ে তন্দ্রা কর ক্ষয়,
ঘুম ভাঙায়ে তখন ভাঙ ভয়।
দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে,
তাহার পরে লুকাও যে কোন্ খানে,
মনে করি এই হারালেম বুঝি,
কোথা হ'তে আবার যে দাও সাড়া॥

১১ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২৯

যতকাল তুই শিশুর মত
রইবি বলহীন,
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।
অল্প ঘায়ে পড়বি ঘুরে,
অল্প দাহে মরবি পুড়ে,
অল্প গায়ে লাগ্‌লে ধূলা
করবে যে মলিন—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন॥

যখনি তোর শক্তি হবে
উঠ্‌বে ভরে' প্রাণ,
আগুন-ভরা সুধা তাঁহার
করবি যখন পান,—
বাইরে তখন যাস্‌ রে ছুটে,
থাক্‌বি শুচি ধূলায় লুটে,
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন,—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্‌ রে ততদিন ॥

১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৩০

আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে
সত্য হবে—
ওগো সত্য, আমার এমন সুদিন
ঘট্‌বে কবে ?
সত্য সত্য সত্য জপি,
সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি,
সীমার বাঁধন পেরিয়ে যাব
নিখিল ভবে,
সত্য, তোমার পূর্ণ প্রকাশ
দেখ্‌ব কবে।

তোমায় দূরে সরিয়ে, মরি
আপন অসত্যে।
কি যে কাণ্ড করিগো সেই
ভূতের রাজত্বে।
আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হব
বাঁচব তবে,—
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে॥

১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৩১

তোমায় আমার প্রভু করে' রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাক্ বাকি।
তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,
সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি,
তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি
ইচ্ছা আমার সেইটুকু থাক্ বাকি।
তোমায় আমার প্রভু করে' রাখি

তোমায় আমি কোথাও নাহি ঢাকি
কেবল আমার সেইটুকু থাক্ বাকি।
তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে'
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে',
রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাক্ বাকি।—
তোমায় আমার প্রভু করে' রাখি॥

১৬ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৩২

যা দিয়েছ আমায় এ প্রাণ ভরি
খেদ র'বে না এখন যদি মরি।
রজনীদিন কত দুঃখে সুখে
কত যে সুর বেজেছে এই বুকে,
কত বেশে আমার ঘরে ঢুকে
কতরূপে নিয়েছ মন হরি'
খেদ র'বে না এখন যদি মরি।

জানি তোমায় নিইনি প্রাণে বরি,
পাইনি আমার সকল পূর্ণ করি।
যা পেয়েছি ভাগ্য বলে' মানি,
দিয়েছ ত তব পরশখানি,
আছ তুমি এই জানা ত জানি—
যাব ধরি সেই ভরসার তরী
খেদ র'বে না এখন যদি মরি॥

১৬ই শ্রাবণ, ১৩১৭

১৩৩

ওরে মাঝি ওরে আমার
মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুন্‌তে কি পাস্‌ দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠ্‌ছে বাজি।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেক্‌বে এবার ঘাটে এসে ?
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি ?

যেন আমার লাগ্‌চে মনে,
মন্দ মধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আস্‌চে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি
কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগুলি তা'র নবীন আছে
এই বেলা যেন সাজিয়ে সাজি

১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৭

১৩৪

মনকে, আমার কায়াকে,
আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই, এ কালো ছায়াকে।
ঐ আগুনে জ্বলিয়ে দিতে,
ঐ সাগরে তলিয়ে দিতে,
ঐ চরণে গলিয়ে নিতে,
দলিয়ে দিতে মায়াকে,—
মনকে, আমার কায়াকে।

যেখানে যাই সেথায় এ'কে,
আসন জুড়ে বস্‌তে দেখে'
লাজে মরি লও গো হরি'
এই সুনিবিড় ছায়াকে।
মনকে, আমার কায়াকে।
তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে
মনকে, আমার কায়াকে॥

১৯শে শ্রাবণ, ১৩১৭

১৩৫

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে
মরচে সে এই নামের কারাগারে।
সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটারে ঐ আকাশ পানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে,
হারাই আমার সত্য আপনারে॥

জড় করে' ধূলির পরে ধূলি
নামটারে মোর উচ্চ করে' তুলি,
ছিদ্র পাছে হয় রে কোনোখানে
চিত্ত মম বিরাম নাহি মানে,
যতন করি যতই এ মিথ্যারে
ততই আমি হারাই আপনারে॥

২১শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৩৬

নামটা যে দিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হ'য়ে—
আপন-গড়া স্বপন হ'তে
তোমার মধ্যে জনম ল'য়ে।
ঢেকে তোমার হাতের লেখা
কাটি নিজের নামের রেখা,
কত দিন আর কাট্‌বে জীবন
এমন ভীষণ আপদ ব'য়ে।

সবার সজ্জা হরণ করে'
আপ্‌নাকে সে সাজাতে চায়।
সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে
আপ্‌নাকে সে বাজাতে চায়।
আমার এ নাম যাক্ না চুকে,
তোমারি নাম নেব' মুখে,
সবার সঙ্গে মিল্‌ব সেদিন
বিনা-নামের পরিচয়ে॥

২১শে শ্রাবণ, ১৩১৭

১৩৭

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমাসম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,
আমি যে প্রাণ ভরি' তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালবাসি।
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয় যে আসে মনোমাঝে॥

২২শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৩৮

তোমার দয়া যদি
চাহিতে নাও জানি
তবুও দয়া করে'
চরণে নিয়ো টানি।
আমি যা গড়ে' তুলে'
আরামে থাকি ভুলে'
সুখের উপাসনা
করি গো ফলে ফুলে-
সে ধূলা-খেলাঘরে,
রেখো না ঘৃণাভরে,
জাগায়ো দয়া করে'
বহ্নি-শেল হানি'॥

সত্য মুদে আছে
দ্বিধার মাঝখানে ;
তাহারে তুমি ছাড়া
ফুটাতে কেবা জানে।
মৃত্যু ভেদ করি'
অমৃত পড়ে ঝরি,
অতল দীনতার
শূন্য উঠে ভরি'।
পতন ব্যথা মাঝে
চেতনা আসি' বাজে,
বিরোধ কোলাহলে
গভীর তব বাণী ॥

২২শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৩৯

জীবনে যত পূজা
হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয়নি সারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা।

জীবনে আজো যাহা
রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও
হয়নি মিছে।
আমার অনাগত,
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তা'রা,
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা ॥

২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪০

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।
ঘন শ্রাবণ মেঘের মত
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক
তব ভবন-দ্বারে।

8—36

নানা সুরের আকুল ধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক্
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,
তেম্‌নি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক্
মহামরণ-পারে ॥

২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪১

জীবনে যা চিরদিন
র'য়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,
জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে,
হে দেবতা, তাই আজি
দিব তব সকাশে,
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে।

কথা তা'রে শেষ করে'
পারে নাই বাঁধিতে,
গান তা'রে স্থর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে।
কি নিভৃতে চুপে চুপে
মোহন নবীনরূপে
নিখিল নয়ন হ'তে
ঢাকা ছিল, সখা, সে।
প্রভাতের আলোকে ত
ফোটে নাই প্রকাশে।

ভ্রমেছি তাহারে ল'য়ে
দেশে দেশে ফিরিয়া,
জীবনে যা ভাঙা গড়া
সবি তা'রে ঘিরিয়া।
সব ভাবে সব কাজে
আমার সবার মাঝে
শয়নে স্বপনে থেকে
তবু ছিল একা সে
প্রভাতের আলোকে ত
ফোটে নাই প্রকাশে।

কত দিন কত লোকে
চেয়েছিল উহারে,
বৃথা ফিরে গেছে তা'রা
বাহিরের দুয়ারে।
আর কেহ বুঝিবে না,
তোমা সাথে হবে চেনা
সেই আশা ল'য়ে ছিল
আপনারি আকাশে,
প্রভাতের আলোকে ত
ফোটে নাই প্রকাশে॥

২৪শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪২

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
আর সহে না,—
দিনে দিনে উঠ্‌চে জমে'
কতই দেনা।
সবাই তোমায় সভার বেশে
প্রণাম করে' গেল এসে,
মলিন বাসে লুকিয়ে বেড়াই
মান রহে না।

কি জানাব চিত্তবেদন
বোবা হ'য়ে গেছে যে মন,
তোমার কাছে কোনো কথাই
আর কহে না।
ফিরায়ো না এবার তা'রে
লও গো অপমানের পারে,
কর তোমার চরণ-তলে
চির-কেনা॥

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৭

১৪৩

প্রেমের হাতে ধরা দেব'
  তাই রয়েছি বসে';
অনেক দেরী হ'য়ে গেল,
  দোষী অনেক দোষে।

বিধিবিধান-বাঁধন-ডোরে
ধরতে আসে যাই যে সরে',
তা'র লাগি যে শাস্তি নেবার
নেব' মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব'
তাই রয়েছি বসে'।

লোকে আমায় নিন্দা করে,
নিন্দা সে নয় মিছে,
সকল নিন্দা মাথায় ধরে'
র'ব সবার নীচে।

শেষ হ'য়ে যে গেল বেলা,
ভাঙ্‌ল বেচা কেনার মেলা,
ডাক্‌তে যারা এসেছিল
ফিরল তা'রা রোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব'
তাই রয়েছি বসে'॥

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪৪

সংসারেতে আর যাহারা
আমায় ভালবাসে
তা'রা আমায় ধরে' রাখে
বেঁধে কঠিন পাশে।

তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারি নূতন ধারা,
বাঁধনাক, লুকিয়ে থাক
ছেড়েই রাখ দাসে।

আর সকলে, ভুলি পাছে
তাই রাখে না একা।
দিনের পরে কাটে যে দিন,
তোমারি নেই দেখা।

তোমায় ডাকি নাই বা ডাকি,
যা খুসি তাই নিয়ে থাকি ;
তোমার খুসি চেয়ে আছে
আমার খুসির আশে ॥

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪৫

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে ?
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচ্‌বে আমার তবে।
আর যাহারা আসে আমার ঘরে
ভয় দেখায়ে তা'রা শাসন করে,
দুরন্ত মন দুয়ার দিয়ে থাকে,
হার মানে না, ফিরায়ে দেয় সবে।

সে এলে সব আগল যাবে ছুটে,
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে,
ঘরে তখন রাখ্‌বে কে আর ধরে'
তা'র ডাকে যে সাড়া দিতেই হবে।
আসে যখন, একলা আসে চলে',
গলায় তাহার ফুলের মালা দোলে,
সেই মালাতে বাঁধ্‌বে যখন টেনে
হৃদয় আমার নীরব হ'য়ে র'বে॥

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৭

8—30

১৪৬

গান গাওয়ালে আমায় তুমি
কতই ছলে যে,
কত সুখের খেলায়, কত
নয়ন-জলে হে।

ধরা দিয়ে দাও না ধরা,
এস কাছে, পালাও ত্বরা,
পরাণ কর ব্যথায় ভরা
পলে পলে হে।
গান গাওয়ালে এমনি করে’,
কতই ছলে যে!

কত তীব্র তা’রে, তোমার
বীণা সাজাও যে,
শত ছিদ্র করে’ জীবন
বাঁশি বাজাও হে।

তব সুরের লীলাতে মোর
জনম যদি হয়েছে ভোর,
চুপ করিয়ে রাখ এবার
চরণতলে হে।
গান গাওয়ালে চিরজীবন
কতই ছলে যে॥

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪৭

মনে করি এইখানে শেষ
কোথা বা হয় শেষ।
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ।

নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন করে' হৃদয় জাগে,
সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই সে উদ্দেশ।

সন্ধ্যাবেলার সোনার আভায়
মিলিয়ে নিয়ে তান
পূরবীতে শেষ করেছি
যখন আমার গান—
নিশীথ রাতের গভীর সুরে
আবার জীবন উঠে পূরে,
তখন আমার নয়নে আর
রয় না নিদ্রালেশ॥

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪৮

শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
এই কথাটি, মনে
আজ্‌কে আমার গানের শেষে
জাগ্‌চে ক্ষণে ক্ষণে
সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজ্‌চে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

তারে যখন আঘাত লাগে,
বাজে যখন সুরে—
সবার চেয়ে বড় যে গান
সে রয় বহুদূরে।
সকল আলাপ গেলে থেমে
শান্ত বীণায় আসে নেমে,
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে
বাজে গভীর স্বনে॥

২৬শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৪৯

দিবস যদি সাঙ্গ হ'ল, না যদি গাহে পাখী,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,—
এবার তবে গভীর করে' ফেল গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমিরতলে।
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে' ঢেকেছ ধরণীরে
যেমন করে' ঢেকেছ তুমি মুদিয়া-পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,
বসনভূষা মলিন হ'ল ধূলায় অপমানে,
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে,—
ঢাকিয়া দিক্ তাহার ক্ষতব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তা'রে নবীন ঊষাপানে
জুড়ায়ে তা'রে আঁধার সুধাজলে॥

৩০শে শ্রাবণ, ১৩১৭।